দাম্পত্যের স্বরূপ

সুকুমারী ভট্টাচার্য্য

দুটি কথা – দাম্পত্যের স্বরূপ

বিবাহ বিষয়টি জটিল ও নানা সমস্যাসংকুল। কোনও সিদ্ধান্তই এখানে চূড়ান্ত বা প্রশ্নাতীত নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বিবাহ–ঐক্যদাম্পত্য–বেশ অর্বাচীন একটি ধাপ। তবু এটি নিয়েই আলোচনা এ কারণে যে, এটি নরনারীর যৌন সম্পর্কের বিবর্তনে ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাসে সম্ভবত শেষতম ধাপ, যেখানে পৌঁছে নরনারী সমাজস্বীকৃত একটা সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ স্থির আছে। এর কিছু ব্যতিক্রম, যা রক্ষণশীল মানুষের কাছে উন্মার্গগামিতা বা উৎকেন্দ্রিকতা বলে প্রতিভাত হচ্ছে তা নিয়ে গত কয়েক প্রজন্ম ধরে একটা প্রশ্ন তুলেছেপ্রশ্নটা তথাকথিত ‘কেন্দ্রের যথার্থ ভূমিকা নিয়ে। মানুষের ইতিহাস কোনও একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এবং সমাজ যুগের প্রয়োজনের অনুকুল বিধান গ্রহণ করে।

এ যুগ বিবাহকে কী কী নতুন সমস্যার মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে, এ সব থেকে নিস্ক্রমণের সম্ভাব্য উপায়ই বা কী, এ সব নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধ। বলা ভাল, সমস্যাগুলি জীবন্ত মানুষের জীবনের স্তরে স্তরে সংলগ্ন, তাই কোনও চূড়ান্ত সমাধান নির্দেশ করার ধৃষ্টতা আমার নেই। শুধু কিছু বিশ্লেষণের দ্বারা সমস্যাগুলিকে স্বরূপে বুঝবার চেষ্টা করেছি; বিশ্লেষণই হয়তো বা কিছু

আলোকপাত করবে। সব কটি প্রসঙ্গ যেহেতু বহুকাল ধরে বহুধা-আলোচিত, তাই নতুন আলোকসম্পাতের সম্ভাবনা কম। শুধু বিশ্লেষণেরও কিছু নিজস্ব তাৎপর্য আছে, এই বিশ্বাসেই কাজটিতে হাত দেওয়া।

সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর সম্পর্কে, পরিবারের বিন্যাসেও যে অনিবার্য প্রভাব পড়ে এবং তার ফলে যে গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায় তা অনুধাবন করে গবেষণা করলে আজকের সমাজে বিবাহের পরিবর্তিত রূপটি বোঝা সহজ হবে। সেই শ্রমসাধ্য গবেষণা করবার মতো শিক্ষাগত প্রস্তুতি ও পরমায়ুগত অবকাশ আমার নেই, তাই এটা লিখতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে, সামাজিক-নৃতত্ত্ববিদ কোনও পণ্ডিত বা পণ্ডিতবর্গ যদি একক অথবা যৌথ ভাবে এ গবেষণায় প্রবৃত্ত হতেন, তা হলে আমাদের সমাজের বিবাহ' নামক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্যক ভাবে বোঝা সহজ হত। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। এ অনুরোধ জানিয়ে রেখে নিজের অপূর্ণতা সম্বন্ধে পাঠকের কিছু সহিষ্ণু প্রশ্রয় কামনা করছি।

এই বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে প্রকাশিত লেখাটি 'গাঙচিল' থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ সংকলনের জন্য সাধ্যমতো পরিমার্জন করার চেষ্টা করেছি। বিবেচনার ভার পাঠকের।

প্রজনার্থা

বিবাহ অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি পুরুষ একটি আধার সঙ্গীর সঙ্গে আমরণ বাস করবে, অন্য কোনও পুরুষ বা নারী তাদের মিলিত জীবনে অনুপ্রবেশ করবে না–এইটিই ছিল প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের পর থেকে বৈবাহিক সম্পর্ক। অবশ্য একটি পুরুষের একাধিক নারীর সঙ্গে সহবাস প্রথা চালু ছিল,

যদিও দ্রৌপদী ছাড়া অন্য কোনও নারী বৈধ ভাবে একাধিক স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে পারেনি। পুরাণের মধ্যে বারে বারে পাওয়া যাচ্ছে বিবাহের অভিমুখ। এখন ওই দিকেই বোধ হয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা বেশি।

ছিয়াশি বছরের দিদিমা; শিক্ষিতা, কিন্তু ইংরেজি জানেন না। সদ্য এম এ পাশ করা নাতনি সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করেন তাকে: 'হ্যারে, কাকে বিয়ে করবি ঠিক করেছিস?'

নাতনি লজ্জায় মিথ্যে বলল, 'না, দিদিমা, এখনও ঠিক করিনি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছি বলতো?'

'দেখ, ধরে দিলে (অর্থাৎ সম্বন্ধ করা) বিয়ে করবি না।'

'কেন?'

'কেন আবার? যে-শাড়িটা তিন বছর পরে ছিঁড়ে যাবে, সেটা কেনার বেলায় দোকানে নিয়ে গিয়ে তোর পছন্দে কেনা হবে, আর যে-মানুষটাকে জীবনে ফেলতে পারবি না, তার বেলায় পছন্দের কথা কেউ তুলবে না? তোর বিয়ে, তুইই করবি, তোর পছন্দে।' একটু থেমে যোগ করেন:

'দেখ, বিয়ের পর আশীর্বাদ করবার সময়ে বলি, 'সাবিত্রীসমানা ভব', অর্থাৎ স্বামীকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনো। বেমালুম ভুলে যাই যে, ওই সাবিত্রই কিন্তু বিয়ের আগে প্রকাশ্যে রাজসভায় নারদের সামনে বাবার সঙ্গে প্রবল তর্ক করেছিল, তার পছন্দের মানুষকে সে বিয়ে করবেই। এক বছর পর বিধবা হবে জেনেও তর্ক করেছিল। এবং জিতেছিল। আশীর্বাদ করবার সময়ে সেই সাবিত্রীর সমান হতে বলি কি? নিজের পছন্দের মানুষকে পেয়ে তার প্রাণ ভরে গিয়েছিল, সেই জোরেই না সে যমের সঙ্গে অতক্ষণ লড়াই করেছিল।

এবং জিতেছিল। এরা দুই সাবিত্রী নয়রে, একটিই মেয়ে, আশীর্বাদ করতে হলে এই মেয়ের দুটো দিক ভেবেই আশীর্বাদ করতে হবে।'

প্রাচীন শাস্ত্রে যে আট রকমের বৈধ অনুলোম বিয়ের কথা বলে তার একটি হল গান্ধর্ব। ওই দিদিমা এই বিয়ের কথা মনে রেখেই কথা বলছিলেন। গান্ধর্ব বিয়েতে গুরুজনের অনুমতি বা সমর্থনের অপেক্ষা না রেখেই পরস্পরের প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন অপরকে জীবনের সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়ে বলে, তারা এখন থেকে স্বামী-স্ত্রী। এ বিয়ে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত, বৈধ ও সমাজে স্বীকৃত। (প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ডে 'কমন ল' ম্যারেজ' ও এই রকমই ছিল। মধ্যযুগের আদিপর্বে আইনে তা স্বীকৃত হয়। মাত্র দু-এক দশক আগে এটি উঠে যায়। এ বিয়েতেও দু-একজনের সামনে দুটি নরনারী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত জীবনযাপনের অঙ্গীকার করত এবং সমাজ সে সম্পর্কটা স্বীকার করত। বেশ কয়েকশো বছর এ পদ্ধতি চালু ছিল।) কিন্তু আজ একবিংশ শতকের দোরগোড়াতে এসেও দুটি মানুষ পরস্পরকে ভালবেসে মিলিত জীবনযাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে অশিক্ষিত বা নিম্নবিত্ত সমাজে। শুধু নয়, বহু শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সমাজেও দু-পরিবারে যে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। তাতে বোঝা যায় আমরা শাস্ত্রের দোহাই তখনই পাড়ি, যখন সে শাস্ত্র আমাদের অভীষ্টের অনুকুল; প্রতিকুল হলে বেমালুম চেপে যাই। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সময়ে বিদ্যাসাগর মশাই সমাজের এই দীর্ঘকালীন স্বার্থসর্বস্ব ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। তার উৎকলিত শাস্ত্রবাক্য তৎকালীন ও পূর্ববর্তী সব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই জানতেন; জেনেও চেপে গিয়েছিলেন, সে শাস্ত্র তাদের স্বার্থবিরুদ্ধ ছিল বলে। গান্ধর্ব বিবাহ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং/বা প্রতিরোধও ওই একই কারণে।

প্রাচীন শাস্ত্রে বৈধ বিবাহ আট রকমের ছিল: ব্রাহ্মা, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর ও পৈশাচ।(১) ব্রাহ্ম বিবাহে সবস্ত্রা সালংকারা কন্যাকে

পিতা উপযুক্ত পাত্রে দান করতেন। দৈব বিবাহে যজ্ঞ কর্মেরত পুরোহিতকে যজ্ঞকালেই কন্যাদান করতেন। কন্যার পিতা। আর্য বিবাহে কন্যার পিতা বরকে একটি বলদ ও একটি গাভী দান করতেন। প্রজাপত্য বিবাহে কন্যার পিতা বর ও কন্যাকে উভয়ে একত্রে ধর্মাচরণ করু'–এই বলে আশীর্বাদ করে কন্যা দান করতেন। আসুর বিবাহে কন্যার পিতাকে অর্থদানে তুষ্ট করে বর কন্যাকে বিবাহ করতে পারত। রাক্ষস বিবাহে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকে রোরুদ্যমান কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করত বর ও তার বন্ধুরা। পৈশাচ বিবাহে ঘুমন্ত অথবা মদমত্ত কন্যাপক্ষীয়দের মধ্যে থেকে ঘুমন্ত কন্যাকে ধর্ষণ করে দিয়ে যেত বর।

লক্ষ্য করলে দেখি, আসুর বিবাহে কন্যাপণ চলিত ছিল। মনে হয়, অনেক আগে কন্যাপণই প্রচলিত ছিল। বিবাহের এ নামকরণগুলি পরবর্তীকালে খ্রিস্টিয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের। ততদিনে সমাজে কন্যাপণ উঠে গেছে, বরপণ চালু হয়েছে। আর্য বিবাহে কন্যার পিতা নিঃসম্বল জামাতাকে তখনকার কালে সংসার পাততে অত্যাবশ্যক গাভী-বলিদা দিতেন; পণ হিসাবে ততটা নয়, যতটা সংসারযাত্রায় রওনা করিয়ে দেওয়ার জন্য। আসুর বিবাহে কন্যাপণ স্পষ্ট ভাবেই অনুষ্ঠিত হত। অনুমান করা যেতে পারে, এটি অন্যান্য বিবাহের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। সেই কন্যাপণেরই স্মৃতি আর্য বিবাহে।(২)

রোমানদের মধ্যেও অর্থ দিয়ে কন্যাকে বিয়ে করার পদ্ধতি চালু ছিল।(৩) পরবর্তীকালে যখন ধীরে ধীরে নারীর সামাজিক অবনমন ঘটে, তখন কন্যাপণও ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বধূ লাভ করাটা বরের পক্ষে অসম্মানজনক হয়ে ওঠে। তাই সে দিনের কন্যাপণবিশিষ্ট বিবাহের সংজ্ঞা হল আসুর অর্থাৎ আর্যরীতি-বহির্ভূত। এর সমর্থনে বলা যায়, পরবর্তীকালের বহু পুরাণে অনুমাত্র কন্যাপণ গ্রহণ করে যে পিতা, তাকে ধিক্কার দিয়ে বলা হয়েছে সে 'কন্যাবিক্রয়ী'। মনে হয় 'কন্যাবিক্রয়ী' সমাজে

অপাঙক্তেয় হয়ে উঠেছিল। ততদিনে বরপণ চালু হয়েছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রেই পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণকারী পিতাকে, পুত্রবিক্রয়ী বলা হয়নি। যদিও ছেলের বিয়েতে পণ নেওয়া মানেই বাপ ছেলেকে বিক্রি করছে, কারণ 'পণ' কথাটির একটাই মানে–দাম। তাই পণ নিয়ে ছেলের বিয়ে দেওয়ার অর্থই হল মেয়ের বাপের কাছে ছেলেটিকে বেচে দিচ্ছে তার বাবা। কিন্তু ততদিনে সমাজে পুরুষতন্ত্র এত প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, এর অর্থ এবং এর অন্তর্নিহিত অপমান কোনও ছেলের বাপ ভেবেই দেখে না, কারণ পুরুষমাত্রই ততদিনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত; নারী ঊনমানব। বরপণ অতি প্রাচীন যুগে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত থাকলেও মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা যেত। যে কোনও কারণেই হোক, ঋষি কক্ষীবান বরপণে ধনী হয়ে ওঠেন: বিয়েতে পান দশটি রথ, বহু নারী ও এক হাজার ষাটটি গাভী। মনে হয় কক্ষীবান গোষ্ঠীপতি হিসাবে বিবাহে দলের কাছ থেকে প্রতীকী রাজস্ব পেয়েছিলেন। (৪) প্রাচীনকালে কোনও গোষ্ঠীপতি যখন গোষ্ঠীর কারও কাছ থেকে কন্যা ও সম্পত্তি পেতেন তখন তার মধ্যে গোষ্ঠী হয়তো প্রচ্ছন্ন ভাবে দলপতিকে রাজস্বই দিত। (৫)

বিয়ের সঙ্গে পাণ ছাড়াও নানা রকম ভাবে অর্থ ও ধনরত্ন জড়িত ছিল। মেয়েটিকে তার বাপের বাড়ির আত্মীয়বন্ধুরা ভালবেসে যা উপহার দিত তা স্ত্রীধন'। বরবধু এক সঙ্গে বসে (তাদের তখনকার সংজ্ঞা হল 'যুতক) দু-বাড়ির কাছে যা পেত তা হল 'যৌতক'বা 'যৌতুক'। মেয়ের বাবা যে দামে জামাই কেনে তা হল 'পণ'। শ্বশুরবাড়িতে ভালবেসে লোকে বরবধূকে যা দেয় তা হল 'সৌদায়িক'। এর মধ্যে শাস্ত্রমতে স্ত্রীধন হল বধুর একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার ওপরে শ্বশুরবাড়ির কোনও অধিকার ছিল না; মেয়েটি তার ইচ্ছা মতো স্ত্রীধন খরচ ও দান করতে পারত। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের বিষয়ে জানতে পারি যে, সেখানে স্ত্রীধনে সত্যিসত্যিই বধুরই একান্ত কর্তৃত্ব ছিল। স্ত্রীর

নিজস্ব সম্পত্তি থাকত, এবং স্বামীর মৃত্যু হলে বা বিবাহবিচ্ছেদ হলে সে এই সম্পত্তি রাখতে পারত। (৬)

কিন্তু পুরুষপ্রধান সমাজ নারীকে কোনও সম্পত্তির ওপরেই সম্পূর্ণ অধিকার দেবে এটা সম্ভব ছিল না, তাই অন্য শাস্ত্রে দেখিশ্বশুরবাড়ির লোকেরা নানা বিশেষ পরিস্থিতিতে স্ত্রীধনে হাত দিচ্ছেন। পাণ একান্ত ভাবে বর ও বরকতাঁর সম্পত্তি। সৌদায়িক এবং যৌতুক বর ও বধূ উভয়েরই। সদ্ভাব থাকলে সম্ভবত প্রয়োজনমতো বা ইচ্ছেমতো দুজনেই তা ব্যবহার করত, আর তা না থাকলে ওই সম্পত্তি (ধনরত্ন অলংকার, এমনকী সম্পন্ন পরিবারে, জমিও) যে পুরুষটির ও তার পরিবারের কর্তৃত্বে চলে যেত এটা সহজেই বোঝা যায়– এমন উল্লেখও শাস্ত্রে আছে। এখানে বলে রাখি, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার, নারীর সামাজিক অবনমন, শোষণ এ নিয়ে যত কথা বলছি বা বলব, তার সবেরই নিশ্চয়ই বহু ব্যতিক্রম ছিল; সুবুদ্ধিসম্পন্ন সহৃদয় স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও পরিবার চিরকালই ছিল, আছে ও থাকবে। কাজেই যে সব কথা বলছি, তা হল শাস্ত্রের মত, যে কোনও ব্যক্তি বা পরিবার যদি বধূটির ওপর অবিচার, অত্যাচার করতে চাইত তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্ত্র তাদের সপক্ষে থাকত। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পর পর্যন্ত যে সব শাস্ত্র রচিত হয়েছিল, তাতে নারীকে নিজের দেহের বা সম্পত্তির ওপরে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে, শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা নারীর রক্ষাকর্তা, নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়; 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যামর্হত'।

বিবাহ সম্বন্ধে আর্থিক সঙ্গতির প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? যে দুটি বিষয়ে পরনির্ভরতা মেয়েদের দাম্পত্যজীবনে বহু অশান্তির সৃষ্টি করে তার মধ্যে একটি হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহিত মেয়ে আর্থিক ভাবে স্বামীর আয়ের ওপরে নির্ভরশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত দুজনের মনের মিল থাকে, ততক্ষণ এতে

অশান্তি আসে না; কিন্তু যখনই কোথাও চিড় ধরে তখনই ওই নির্ভরতার ব্যাপারটা পরিণত হয় নিপীড়নের হেতুতে। বহু পরিবারের পরিণত বয়সের গৃহিণীরও স্বামীর অর্থ ইচ্ছামতো খরচ বা দান করবার অধিকার থাকে না। অন্যটাও অবশ্যই সত্য: বহু পরিবারে স্বতন্ত্র আয় না থাকলেও গৃহিণীই আয়-ব্যয়ের পুরো দায়িত্ব পান। কিন্তু যেখানে আর্থিক ভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল বধূ সহসা আবিষ্কার করে খাওয়া-পরার নির্দিষ্ট বরাদ্দের বাইরে তার কোনও সম্বল নেই, পারিবারিক ধন ভাণ্ডারে তার কোনও কর্তৃত্ব নেই, এমনকী তার খাওয়াও শ্বশুরবাড়ির হাত-তোলা ব্যবস্থায়, অর্থাৎ অন্যদের তুলনায় তার খাদ্য, পুষ্টি স্বাদ বা পরিমাণে কম হলেও তার প্রতিবাদ করবার কোনও অধিকার নেই–তখনই তার বিবাহিত জীবন তার কাছে আর্থিক বন্দিত্ব হয়ে দেখা দেয়। এর সমাধানে বিস্তর মেয়ে বাইরে কাজ করে। সেটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী ও তার পরিবারের অনুমতিসাপেক্ষ এবং সব ক্ষেত্রে সে অনুমতি মেলেও না। অনুমতি মিললেও, বন্ধুটি স্বাধীন ভাবে উপার্জন করলেও সে অর্থে তার অধিকার কমই থাকে। এবং বহু উপার্জনশীল বধূরও শ্বশুরবাড়িতে নিগ্রহ চলতেই থাকে। এর একটা কারণ, খুব কম ক্ষেত্রেই মেয়েটি ওই অপমানের পরিসর ছেড়ে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র সংসার পেতে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চায় বা পারে। সমাজ ও পরিবার এ দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দুর্ব্যবহার চালিয়ে যায়। তখন বেড়ে ওঠে তিক্ততা, বিবাহ টলে ওঠে, মাঝে মাঝে ভেঙেও যায়। যখন ভাঙে না, তখন বন্ধুটি আর্থিক ভাবে হাত-পা বাধা অবস্থায় পরিবারের পোষ্য হিসাবে গ্লানির অন্ন গ্রহণ করে। স্বাধীন উপার্জনে অবশ্যই কতকটা সুরাহা হয়, যদিও এ দেশে কন্যার মন আশৈশব পুরুষের প্রতি যে বশ্যতা-শিক্ষার মধ্যে লালিত হয়, তাতে বহু ক্ষেত্রেই নিজের উপার্জিত অর্থের ওপরেও সে পুরো কর্তৃত্ব পায় না। চাইতে সাহস পায় না, বা চাইলেও প্রত্যাখ্যাত হয়। তবু ওই স্বতন্ত্র উপার্জনের জোরে বেশ কিছু মেয়ে দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে অন্যত্র যাওয়ার পথ খুঁজে

পায়। এই সম্ভাবনা রোধ করবার জন্যই নারীকে ধনের কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করার শাস্ত্র রচিত হয়েছে আড়াই হাজার বছর ধরে।

দ্বিতীয় যে বিষয়ে শাস্ত্র নারীর কোনও কর্তৃত্ব মানেনি, তা হল, তার নিজের দেহের ওপর অধিকার। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি রচনা বলে অনুমান করা হয়। সেখানে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য দাম্পত্য ব্যাপারে স্বামীকে পরামর্শ দিচ্ছেন:

স্ত্রী যদি স্বামীর কামনা পূরণ করতে অস্বীকার করে তা হলে প্রথম তাকে মধুর বাক্যে বশীভুত করবার চেষ্টা করবে। সেটা নিস্ফল হলে তাকে 'কিনে নেবে'। (অবক্রীণীয়াৎঅর্থাৎ আভরণ, ইত্যাদি দেওয়ার লোভ দেখাবে বা দেবে।) তাতেও যদি সে না। রাজি হয় তা হলে লাঠি দিয়ে বা হাত দিয়ে মেরে স্ববশে আনবে। (৭)

এ হল ঋষিবাক্য, এর ভিত্তি আরও দুশো বছর আগেকার প্রাচীন সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বচন: ধন বা নিজ দেহের ওপরে নারীর কোনও অধিকার নেই। (৮) এ ধরনের শাস্ত্রবাক্যের উদ্দেশ্য বধূর যৌনজীবনের সব স্বাধীনতা হরণ করা; স্বামীই তার যৌনজীবনের নিয়ন্তা হয়ে থাকবে।

এর দুটি দিক: বিবাহ স্বামীকে স্ত্রীর দেহের ওপর সর্বতোভাবে এমন অধিকার দিয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীর দেহকে সম্ভোগ্য সামগ্রীর মতো ইচ্ছা মতো ভোগ করবে; সে বিষয়ে স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও দাম থাকবে না। যাজ্ঞবল্ক্য থেকে এই বিধি শাস্ত্রের, সমাজের ও পরিবারের অনুমোদন পেয়ে এসেছে। শখানেক বছর আগে ১৮৮৭ সালে রুক্মা বাঈ স্বামীর যৌন সম্ভোগের অধিকার প্রত্যাখ্যান করেন। তার যুক্তি, বাল্যে তাঁর মত না নিয়ে যে বিবাহ ঘটেছে তার ভিত্তিতে এখন তার দেহের ওপরে স্বামীর কোনও কর্তৃত্ব তিনি

স্বীকার করেন না। ১৮৮৯ সালে দশ বছরের বালিকা বধূ হরিমতির ওপরে বলাৎকার করে তাকে মেরে ফেলে উনত্রিশ বছর বয়স্ক স্বামী হরি মাইতি। এ মৃত্যুর ভিত্তি ঘোরতর শাস্ত্রীয়: বধূর রজোদর্শনের পরেই স্বামীর কর্তব্য গর্ভধান করা। এ ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে স্বপক্ষে বিপক্ষে মতভেদ ঘটতে থাকে। সহবাসে নারীর সম্মতি আপেক্ষিত এবং সেই সম্মতিদানের বয়স দশ থেকে বারোয় উন্নীত করবার জন্যেইংরেজরা একটি আইন প্রবর্তন করতে চায়। বহু আপত্তিজনক রাজনৈতিক অত্যাচারমূলক আইন এর আগে পাশ হয়েছিল। কাগজে মৃদু গুঞ্জন অথবা তীব্র আপত্তিতেই সে-সব প্রতিবাদ অবসিত হয়। কিন্তু সহবাসে সম্মতির প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদে কলকাতার প্রথম বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯১ সালে।

এ পুরনো কাসুন্দি ঘাটছি। কেন? কারণ কাসুন্দিটা সত্যিই পুরনো নয়। এখনও দাম্পত্যে ধর্ষণ, অর্থাৎ বধূর সম্মতির অপেক্ষা না রেখে সম্ভোগ খুবই সাধারণ ঘটনা। শয্যাকক্ষে অসহায় নারীটির আজও কোনও আশ্রয় নেই। বলা বাহুল্য, বহু বিয়েই এই দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভেঙে যায়। অথবা সহায়সম্বলহীন বধূটিকে নিরুপায় ভাবে স্বামীর কাছ থেকে অহরহ নিষ্প্রতিকার অত্যাচার সহ্য করে যেতে হয়। অর্থাৎ সমাজের চোখে বিয়েটা ঠিকই আছে, কিন্তু দম্পতির অর্ধাংশের কাছে সে বিয়ে চুরমার হয়ে গেছে। যাজ্ঞবল্ক্য থেকে আজ পর্যন্ত এই অত্যাচার অব্যাহত আছে। নারীর এই অসহায়তার একটা হেতু তার অর্থনৈতিক পরতন্ত্রতা। আর্থিক ভাবে ভরণপোষণের জন্যে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির ওপরে নির্ভরশীল হওয়ার ফলে নিজের শরীরের ওপরেও নারীর কর্তৃত্ব থাকে না। যে সব বিধি বিধান যৌনতার প্রকাশ, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলির সাফল্য নারীটির আর্থিক অবস্থারই প্রতিবিম্বন। সংবিধান, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে বিস্তর অসামঞ্জস্য থাকে; নারীর অধিকার খণ্ডিত হতে পারে সংবিধানবহির্ভূত পক্ষপাতিত্বে।(৯) অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে সার্বিক অধীনতা তাকে মেনে

নিতে হয়। আর ওই পরাধীনতার অন্তরাল থেকে বিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রশক্তিপ্রাচীনকালে শাস্ত্রের মাধ্যমে, পরে আইনের দ্বারা।

এখনও এ দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ের ব্যাপারে মেয়েটির মত একান্তই গৌণ। সে আন্দৌ বিয়ে করতে চায়। কিনা, কখন করতে চায়, কাকে করতে চায়, তার জন্য যে পাত্র নির্বাচন করা হয়েছে তাকে তার পছন্দ। কিনা। এ সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনাই হয় না। শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেলেও, মনে রাখতে হবে এখনও এই শ্রেণিটি দেশে সংঘ্যালঘু। কাজেই অধিকাংশ মেয়ের যেহেতু বিদ্যা, স্বতন্ত্র বৃত্তি বা আর্থিক স্বনির্ভরতা নেই, তাই তার সামনে বিবাহ ছাড়া যৌবনোত্তর জীবনে আর কোনও পথই খোলা থাকে না: বিবাহ বাধ্যতামূলক হয়েই দেখা দেয়। নতুনত্ব সম্বন্ধে কৌতুহল বাদ দিলে খুব কম মেয়েই স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হয়। পাশ্চাত্য জগতে উনিশ শতকে এই রকমই ছিল। জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৬৯ সালে লেখেন 'যারা মেয়েদের সামনে আর সব দরজা বন্ধ করে তাদের বিয়ে করতে বাধ্য করে, তাদের সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়: তাঁরা যা ভাবেন সেটাই যদি বলেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তাদের মতটা হতে হবে–পুরুষ নারীর কাছে বিবাহিত জীবনকে এমন বাঞ্ছনীয় করে তোলে না যাতে মেয়েরা বিবাহের নিজস্ব আকর্ষণেই বিবাহে প্রবৃত্ত হবে।'(১০) বিবাহে নারীর সাগ্রহ, সানন্দ সম্মতি থাকবে শুধু তখনই, যখন সে স্বনির্বাচিত পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে। এখনও দেশের অধিকাংশ নারীই এ সুযোগে বঞ্চিত। কাজেই বিবাহ নারীর জীবনের একটা অবস্থামাত্রই নয়, তার যৌবনোত্তর জীবনের লক্ষ্যও। জীবনের পথ নয়, গন্তব্যস্থল। সেখানে পৌঁছে যেন তার ব্যক্তিগত জীবনের সব দ্বন্দ্বের, শঙ্কার, অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে; এবং গভীর এক অর্থে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তারও অবসান ঘটে। অথচ এ যে কত বড় ভ্রম তা অল্প দিনেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শাস্ত্র নারীকে নিজদেহের ওপর অধিকার দেয়নি এবং সব দেশেই প্রাচীন কালে শাস্ত্রই ছিল। সংবিধান। এই শাস্ত্রবিধি বলেছে, নারীর যৌনতার ওপরে পূর্ণ অধিকার তার স্বামীর এবং প্রকারান্তরে তার শ্বশুরবাড়ির এবং তারও ওপরে সমাজের। এক্ষেত্রে, সে গর্ভধারণ করতে চায় কিনা, কখনও ও কতবার চায় সে সম্বন্ধে তার মত প্রায় কখনওই গ্রাহ্য করা হত না এবং এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না। ফলে অবাঞ্ছিত গর্ভভারে ক্লান্ত ক্লিষ্ট জননীর মধ্যে স্বভাবতই একটি তীব্র প্রতিবাদের উষ্মা সঞ্চিত হত এবং হয়। এত দিন পর্যন্ত শাস্ত্র-সংবিধানের প্রতিবাদ করবার কোনও অধিকার নারীর ছিল না, কিন্তু এখন যখন বহু দেশে বিবাহ মানেই একমাত্র স্বামীর ইচ্ছাক্রমে সন্তানধারণ আর বাধ্যতামূলক নয়, বহু নারী এ ব্যাপারে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এটা এমন এক পর্যয়ে পৌঁছেছে যে, সেখানে বহু নারী একটি সন্তানধারণ করতেও অনিচ্ছক। জনসংখ্যা কমছে, প্রতিকারে তৃতীয় বিশ্বের দুঃস্থ জনক জননীর সন্তানকে দত্তক হিসেবে বরং কেউ কেউ গ্রহণ করছেন, কিন্তু নিজেরা মাতৃত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিমুখ, কোনও মতেই সন্তানধারণ করবেন না। সন্তানধারণ, প্রসব, শিশুর প্রাথমিক লালনের পরিশ্রম–এবং বলা বাহুল্য। এ সবই সংসারের বিস্তার হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তির সঙ্গে সংযুক্ত। তার ওপর আছে প্রায় সব সংসারেরই নারীর অপুষ্টি, প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য ও পুষ্টি। এই স্মৃতি অবশ্যই তাকে বারবার গর্ভধারণে বিমুখ করে তোলে। এখনও স্বামী ও শাশুড়ির গঞ্জনা এবং তাদের ওপর। সার্থক নির্ভরতা তাকে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ থেকে অব্যাহতি দেয় না। এ অবস্থা বেশ কিছুকাল চলছে, ফলে কিছু মানুষ আতঙ্কিত; জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ফলে কিছুকালের মধ্যে প্রজাতি বিলোপ ঘটবার আশঙ্কা। কিন্তু মনে হয়, স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সমন্বয়ের (thesis, antithesis, synthesis) যে নিয়মে সংসার আবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে, এটি সেই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় দশা: প্রতিস্থিতি। মাতৃত্বের নিজস্ব মাধুর্য ও আকর্ষণ আছে, অবশ্যই কিছু নারী প্রলুব্ধ হবে নিজস্ব সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে ও লালন করতে। এর পূর্বশর্ত

অবশ্যই হবে এই যে, গর্ভধারণ ও সন্তান-প্রসবের ব্যাপারে তার পরিচর্য ও আরামের দায়িত্বটা পরিবার ও সমাজ নেবে এবং জাতকের প্রথম পর্যায়ের লালনকালে স্বামী স্ত্রীকে সাহায্য করবে।

আরও একটি কারণে পাশ্চাত্য জগতে মাতৃত্বে এই অনীহা দেখা দিয়েছে। এটা হল নারীর মাতৃত্ব-নিরপেক্ষ যে যৌনতা, তার স্বীকৃতি সে দাম্পত্যে চাইছে। তার যৌনতার স্বতন্ত্র মূল্যেই সে নারী। মাতৃত্ব অবস্থামাত্র, একটি অতিরিক্ত গৌরব। কিন্তু নারীর যৌনতাকে পুরুষ যতটা ভোগ করে, তার পরেও যে সে নারী এবং তার রূপযৌবন ও যৌনতা অন্য পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় থাকে, এ সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন সংশয়, ঈর্ষা ও অসহিষ্ণুতাও হয়তো পুরুষকে প্রবৃত্ত করেছে মাতৃত্বকেই নারীর চূড়ান্ত সার্থকতা হিসাবে রূপায়িত করতে। এ ব্যাপারে ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে যে ভাবছিল সে সম্বন্ধে শুনি, নারীর এই যৌন ক্ষমতাসম্বন্ধে অসুস্থ ভিক্টোরিয়ানরা প্রায়ই এই অনুভূত শক্তিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবে তরলিত করে নারীত্বকে মাতৃত্বের আরও আত্মত্যাগনিষ্ঠ ও সহনীয় পবিত্রতায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল। (১১)

এ ব্যাপার ভারতবর্ষে আরও বেশি প্রকট। রাধা ও সরস্বতী বাদে দেবী মূর্তিগুলি সবই মাতৃমূর্তি, এ-যেন মাতৃত্ব সম্বন্ধে এই আতিশয্যেরই এক প্রকাশ। দৈনন্দিন জীবনে নারীর ঊনমানব অবস্থানের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই যেমন পূজার কদিন মাটির প্রতিমাকে মাতৃসম্বোধন করে রক্তমাংসের নারীর প্রতি সারা বছরের আচরণের পাপক্ষালন ও ক্ষতিপূরণ করা হয়, এ-ও তারই এক প্রকাশ। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রে, পরিবারে সমাজে বরাবর শুনি, নারীর জীবন মাতৃত্বে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; কখনও কেউ বলে না পুরুষ পিতৃত্বে পূর্ণ হয়। মাতৃত্বের বহু দায় আছে, পিতৃত্ব শুধুই আনন্দের; তাই এই অসম দৃষ্টি। মাতৃত্বে নারী অবশ্যই গৌরবান্বিত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিতৃত্বকেও সম্মান করে দুটি অবস্থারই দায়িত্ব এবং অধিকার সমান ভাবে ভাগ করে

নেওয়ার একটা লক্ষ্য থাকা উচিত। কোনও দেবতাই পিতৃত্বের জন্যে মহীয়ান নয়, কিন্তু সর্বদেশে মাতৃদেবী মহীয়সী। ওই মহিমা বর্তীয় মর্ত্যনারীতে, এবং নারীকে কেবলমাত্র মাতৃত্বে আবদ্ধ করে রাখলে তার যৌনতা সম্পর্কে আতঙ্ক থেকে অব্যাহতি পায় পুরুষ সমাজ। তাই বেদ থেকে পুরাণে বারবার নারী সম্বন্ধে কামনা ও আশীর্বাদ উচ্চারিত হয়েছে, সে যেন অশূন্যোপস্থা হয়, অর্থাৎ তার কোল যেন কখনও খালি না থাকে, ক্রমান্বয়ে সন্তানজন্ম দিয়ে যেন সে তার নারীজন্ম সার্থক করে। এ কথা ঠিক যে, উৎপাদনব্যবস্থা যখন আদিমস্তরে থাকে তখন কৃষক-শ্রমিক-সৈন্যের প্রয়োজনে মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কামনা করবে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কোলে শিশুকন্যা এলেও তো কোল ভরে, এবং 'অশূন্যোপস্থা' হওয়ার আশীর্বাদটা তো ও সম্ভাবনা মনে রেখেই। অবশ্য সমাজ নারীর কাছে পুত্র সন্তানই চায়। শিশুকন্যা অবহেলার বস্তু। কিন্তু যৌবনে পৌঁছনোমাত্রই নারীর পক্ষে বিবাহ অবশ্য কর্তব্য হয়ে ওঠে এবং অতঃপর সমাজে তার স্থান বধূ ও সম্ভাব্য জননীরূপেই। শুধু নারী বলেই তার যা আকর্ষণ সেটা সমাজের পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত ছিল। তাই তাকে হতে হল জননী। (কুমারী সরস্বতী উপাসনার কোনও সম্প্রদায় গড়ে ওঠেনি, কৃষ্ণ ছাড়া শুধু রাধাকে অবলম্বন করেও নয়।) এই নিরবচ্ছিন্ন মাতৃত্বে অভিশপ্ত নারী আজ যদি প্রতিবাদ করে বলে, 'দাম্পিত্যে আমি শুধু নারী বলেই মহীয়সী থাকতে চাই, জননী হতে চাইনা'–তা হলে বহু যুগ ধরে গর্ভভারে জর্জরিত নারীর এই প্রতিবাদ বোঝা যায়। এবং এ অবস্থা সার্বিক বা চিরস্থায়ী হবে না, এ হল প্রতিবাদপ্রতিস্থিতি। এর পরে সংহতি আসবে সমন্বয়ের রূপ ধরে। এ ক্ষেত্রে দাম্পত্য রক্ষা পাচ্ছে দম্পতির মর্যাদাতেই; নিঃসন্তান হলেও নারীর নারীত্ব ক্ষুন্ন বা হীন হয় না সেটা প্রতিপন্ন করাই এ প্রতিবাদের উদ্দেশ্য।

স্ত্রী কখন সন্তানধারণ করতে চায়, কতবার চায় ও আদৌ চায়। কিনা। এ সম্বন্ধে স্বামী ও সমাজই শেষ সিদ্ধান্ত নেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন–

সে শস্যই হোক, শিল্পই হোক, সন্তানই হোক— ঘটবে পুরুষের ইচ্ছায়। এর পেছনে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও প্রবর্তনা প্রচ্ছন্ন থাকে। সন্তান উৎপাদনের সফলতার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য এবং সমকালীন অর্থনীতির বিধানের কাছে এই উৎপাদনব্যবস্থা সমর্পণ করবার জন্য রাষ্ট্র নারীর নিজদেহের ওপরে তার নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই নারী নিজদেহের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে।(১২) মনু নারীকে 'মহাভাগা পূজাহাঁ গৃহদীপ্তি' বলেছেন, কিন্তু তার ঠিক আগে এ সব বিশেষণের হেতুটিও উল্লেখ করেছেন: 'প্রজনার্থী; সন্তানের জন্ম দেয় বলেই সে মহনীয়া পূজনীয়া এবং গৃহের দীপ্তিস্বরূপিণী।'(১৩) এই সন্তানজন্মও পুরোপুরি পুরুষের ইচ্ছাধীন। অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের দুঃসহ বোঝা ও গ্লানিত্বে কত সংসারে যে দাম্পত্য বাধুটির কাছে বিষাক্ত হয়ে ওঠে তার ইয়ত্তা নেই। বহু দম্পতির মধ্যে সেই পারস্পরিক সমতার সম্পর্ক নেই যার ফলে দু'জনে একমত হয়ে সন্তানের আগমন আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। এর ফলে পুরো গর্ভধারণের ব্যাপারটাই নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তার ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে দৃকপাত না করে। সংসার চলতে থাকে হয়তো, কিন্তু তার দাম্পত্যের ভিতটা যায় টলে। অর্থাৎ দাম্পত্যকে আটকে রাখা হয়েছে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার ওপরে।

———————-

(১) আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (১.৬) অংশে এগুলির বিবরণ আছে, অন্যান্য গৃহ্যসূত্রেও আছে।

(২) কন্যাপণের কথা পাই ঋগ্বেদে (১:১০৯:২); অথর্ববেদে (১৪:১৩২:৩৩) এবং পরবর্তীকালে কাত্যায়ন গৃহসূত্রে (২:৪:২) এবং আরও অন্য বহু শাস্ত্রাংশে। গোভিল গৃহ্যসূত্রে পড়ি, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়ই উভয়কে স্বর্ণদান করত, তবে বরপক্ষ অনেক বেশি সোনা দিত। (২:৩:৪); কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রে (২:৪:২)

কন্যাপণের কথা আছে। এ ছাড়া পরবর্তী সাহিত্যে কন্যাপণের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আছে।

(৩) Grant and Ktzinger: Civiliation in the Ancient Mediteranea

কনকাঞ্জলি

বিবাহ – বি + √বহ+ ঘঞ; অর্থ বিশেষ ভাবে বহন করা। বিশেষ ভাবে, অর্থাৎ দেহমানের সব অসুবিধে, সংকটের সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করা। বিবাহ একটি বিশেষ দায়িত্ব যা শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। বিয়ে বা বিয়েবাড়ি বলতে চোখে ভাসে শানাই, আলো, ভিড়, রান্নার গন্ধ, হৈ-হট্টগোল, অল্পস্বল্প বাদবিতণ্ডা, উচ্চহাস্য, রঙিন শাড়ি, সুদৃশ্য (কখনও কুদৃশ্যও) গয়না, গান, অনবরত লোকজনের আনাগোনা–পুরো আবহাওয়াটাই উৎসবের। কিন্তু তারও আগে একটা উদ্যোগপর্ব আছে, যেটা শুরু হয়। ঘটকালি থেকে। পাত্রপাত্রী নির্দিষ্ট হলে বরপক্ষ কনে দেখে, কনেপক্ষ বর দেখে। তার পরে দেনাপাওনার দীর্ঘ সংগ্রাম এবং দু-পক্ষের দরদরির নিষ্পত্তি হলে তবে বিয়ের প্রস্তুতি। আশীর্বাদ, অধিবাস, গায়েহলুদ, বিয়ে, বী-ভাত। এখনও ভারতবর্ষে অধিকাংশ বিয়ের ছকটা মোটামুটি একই রকম। লক্ষ্য করা যায় যে, সমস্ত প্রস্তুতি পর্বজুড়ে যে দীর্ঘজটিল প্রক্রিয়াটি চলে তার নিয়ামক দুটি পরিবোর; নেপথ্য থেকে চালায় সমাজ, তার নেপথ্যে থাকে রাষ্ট্র। কিন্তু সবচেয়ে গৌণ, সবচেয়ে নেপথ্যবতীর্ণ এবং এক হিসাবে সবচেয়ে উপেক্ষিত হল সেই দুটি মানুষ যাদের বিয়ে হচ্ছে। এখন শহরে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত মেলে যেখানে সম্বন্ধ করে যে বিয়ে সেখানেও বরের পছন্দ অপছন্দের কিছু দাম

দেওয়া হয়; তার চেয়ে অনেক কম ক্ষেত্রে কনের পছন্দের ওপরে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ দেশে এখনও বর-কনে বিয়ে করে না, তাদের বিয়ে হয়; তারাই সবচেয়ে নিস্ক্রিয়, বিয়ের সময়ের আগে তারা নেহাৎই দুটো প্রতীক হিসেবে থাকে।

বিবাহ একটি দ্বিপাক্ষিক যৌথ কর্ম। ম্যাকফারলেন যেমন বলেছেন, 'বিবাহ একটা দলগত খেলা এবং দম্পতিটিকে, বিশেষত বন্ধুটিকে বিবাহের দিন পর্যন্ত সব হাঙ্গামার বাইরে রক্ষা করা হয়।'(১) এই রকম বিয়েতে বরকনের ইচ্ছে রুচি, সম্মতি আপত্তি সম্বন্ধে পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের একটা ঔদাসীন্য বা তাচ্ছিল্য থাকে। বলা বাহুল্য, প্রথম বিবাহে বর-কনে অনভিজ্ঞ দু-পক্ষের অভিভাবক গুরুজনেরা ভাবেন ও বলেন বরকনে তো নেহাৎ অর্বাচীন, অনভিজ্ঞ, একটা আমরণ চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যে-বিয়ে, সে সম্বন্ধে ওরা কী বোঝে? তার মধ্যে কত ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকে, নিছক যৌবনসুলভ আবেগেই নারীপুরুষের মিলনের প্রবর্তনা এটা নয়, এ ভাবে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো স্থৈর্য তাদের থাকে না। অতএব প্রবীণ, বিবাহিত, বহুদশী, অভিজ্ঞ গুরুজনরাই কেবল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। এ সব তত্ত্বকথার পেছনে কখনও কখনও সদিচ্ছা অবশ্যই থাকে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ক্ষেত্রে থাকে 'আমার-পাঠ আমি ল্যাজে কাটিব।' এই মনোভাব। আরও থাকে ব্যবসায়িক মনোভাব–এখনও অধিকাংশ অভিভাবকরা পণযৌতুক নিয়ে দরদরি–প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন ভাবে–রীতিমতো উপভোগ করেন। অতএব ছেলেমেয়ে মানুষ করার পূর্ণ মূল্য শোধ করে নেন তাদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করে। অবশ্য যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বধূটি শ্বশুরবাড়িতেই বাস করতে আসে, তাই সম্ভাব্য নতুন পারিবারিক সদস্যকে যাচাই করে নেওয়ার মধ্যে তাদের একটা প্রত্যক্ষ স্বার্থও থাকে।

বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি আছে। কিছু কিছু বৈদিক অনুষ্ঠান রয়ে গেছে–বৈদিক যুগের শেষাংশের, সঙ্গে কিছু বৈদিক মন্ত্রও। কিন্তু তার সঙ্গে এসে জুড়েছে বিস্তর লৌকিক অনুষ্ঠান। শুধু স্ত্রী-আচারে নয়, বিয়ের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেও এগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। যুগে যুগে বিকশিত হয়ে পরিবর্ধিত আকারে এখন যা দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে আছে বরকে আসনে বসিয়ে সবস্ত্রা সালংকারা কন্যা দান করা। হোম করা হয়, আবার বহু পরবর্তী যুগের সংযোজন শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতীক হয়ে সাক্ষী থাকেঅগ্নির মতো। বৈদিক যুগের মতো পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন হয়। ষোক্তবন্ধন অর্থাৎ বরকনের কাপড়ের শেষ প্রান্তে গিট বাঁধা হয়। মালাবদল অর্বাচীন কালের সংযোজন। পুরনো কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত আকারে রয়ে গেছে, যেমন অশ্বারোহণ। এটি বৈদিক; বর একখণ্ড পাথর বধুর সামনে রাখলে সে তার ওপরে দাঁড়ায়, তখন বর বলে, ওই পাথরের মতো স্থির হয়ো।(২) তেমনই বহু প্রাচীনকালের রীতি অনুসারে ধ্রুবনক্ষত্র ও অরুন্ধতী দর্শনের স্মৃতিমাত্রই অবশিষ্ট আছে; সত্যিকার নক্ষত্র দুটিকে এখন বেশি কেউ চেনেও না, দেখেও না। কিন্তু মন্ত্রটি জরুরি। বর সেটি বলে: আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুবা, এই জগৎ ধ্রুব, ধ্রুব এই পর্বতরা, এই স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুবা।(৩) লক্ষণীয়, ধ্রুবত্ব, স্থিরত্ব শুধু বাধুটির কাছেই আপেক্ষিত। সে-ই প্রতিজ্ঞা করবে। আমি পতিকুলে ধ্রুবা হব, অরুন্ধতীর দ্বারা আমি অবরুদ্ধ। অর্থাৎ প্রাচীন পতিব্রতা ঋষিপত্নী আমাকে পতিকুলে স্থির থাকবার জন্যে অবরুদ্ধ করেছেন। পাণিগ্রহণের পরে বধুর শুদ্ধির জন্যে বর কিছু মন্ত্র পড়ত–ছাটি আহুতি দিত বিনা মন্ত্রে এবং বলে যেত, ‘এই নারীর চোখের পাতার চুল, মাথার চুল, চরিত্র, কথা, হাসি, দেহ ও বস্ত্রের রন্ধ্র থেকে নিঃসৃত রশ্মিকণা (আরোক), দন্ত, হস্ত, পদ, উরু, উপস্থ, জঙ্ঘা সন্ধিতে, তার সর্বাঙ্গে যা কিছু ঘোর ও অশুচি আছে, তা শুদ্ধ হোক।’

প্রশ্ন আসে, পুরুষ কি স্বতই শুচি, আর যত অশুচিত তা শুধু নারীর দেহে মনে আচরণে? তা শোধন করার দায় বা অধিকার কোথা থেকে পায় পুরুষ? আসলে তার চাই একটা শুচি কুমারী কন্যা এবং সম্ভাব্য অশুচিতার প্রতিকার স্পর্ধা শাস্ত্রই পুরুষকে জুগিয়েছে। পুরুষের অশুচিতার সম্ভাবনা পর্যন্ত শাস্ত্রে স্বীকৃত নয়। এই বৈষম্যের ভিত্তিতেই শাস্ত্রে নিষ্পন্ন হয় বিবাহ, এবং অনুষ্ঠানের পদে পদে এই বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। কন্যার পিতা ভাবী জামাতাকে আসন দিয়ে অভ্যর্থনা করে বলেন 'আপনাকে অর্চনা করছি' (আর্চয়িষ্যামো ভবন্তম) এবং জামাতা অনুমতি দেয় 'হ্যা, অর্চনা করুন' (ওমা অর্চয়)। সম্প্রদানের মধ্যেও কন্যা ব্যক্তি থেকে বস্তু হয়ে ওঠে; সে বস্তুর তৎকালীন মালিক পিতা ভাবী মালিক জামাতার কাছে কন্যারূপ বস্তুটিকে দান করেন–সবিস্ত্রা, সালংকারা, এবং পণযৌতুক সহ। এর মধ্যেও প্রচ্ছন্ন থাকে বধুটির সামাজিক সত্তার অবমাননা, তাকে বস্তু রূপে হস্তান্তরিত করা।

বিয়ের প্রায় প্রতি পর্বে এই ধরনের অবমাননা অন্তর্নিহিত ছিল। একটি মাত্র মন্ত্রে কন্যার দীর্ঘ আয়ু কামনা করে বলা হয়েছে, তুমি সম্পদ ধারণ কোরো। বলা বাহুল্য, এ সম্পদ তার পতিকূলেরই, কোনও সম্পত্তিতে কন্যার তো স্বতন্ত্র কোনও অধিকার ছিল না। একটি অনুষ্ঠানে কন্যা মাদুরে পা রাখবে, তখন উচ্চারিত হবে 'পতি দেবতা' এবং 'পতিযান কামনীয়' অর্থাৎ কন্যা কামনা করছে যে, সে পতিলোকে যেতে পারে। যেটা লক্ষণীয়, তা হল শাস্ত্রে অন্য দুটি যান আছে 'দেবযান' ও 'পিতৃযান', অর্থাৎ দেবালোক থেকে মোক্ষ ও পিতৃলোক থেকে পুনর্জন্মের পথ। দেবতা ও পিতৃগণের মতো উচ্চ আসন সৃষ্টি হল পতির, এবং পত্নীর কামনা হল, সে যেন পাতিলোকে ঠাঁই পায়। লাজহোম (আগুনে খই দিয়ে হোম) অনুষ্ঠানে পতির দীর্ঘায়ু, শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করে বধু বলে, তার শ্বশুরবাড়ির সকলের যেন শ্রীবৃদ্ধি হয় (দীর্ঘায়ুবিস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবত্বেধস্তং জ্ঞাতিয়ে মম)। সপ্তপদীগমনের মন্ত্রগুলিতে

উভয়ের মিলিত জীবনের শ্রীবৃদ্ধির কামনা আছে। পাণিগ্রহণের মন্ত্রে বরবধূকে বলে: 'আমার ব্রতে তুমি তোমার হৃদয় ধারণ করা, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হোক। বৃহস্পতি তোমাকে আমার জন্য নিযুক্ত করুন।'(৪) লক্ষণীয়, বন্ধুটিরও যে চিত্ত আছে, আগামী বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে যে তারও কিছু স্বপ্ন, কিছু কামনা থাকতে পারে সে বিষয়ে শাস্ত্র ও সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন। এক সময় বর বধু সম্বন্ধে প্রার্থনা করে, এর যে পতিঘাতিক তনু তাকে ধ্বংস কর, 'এর যে পুত্রহীনা তনু, পশুহীনা তনু তা দূর হোক–যাস্যাঃ পতিয়ী তনুস্তামস্যা অপজহি, যাস্যা অপুত্র্যা তনুঃ যাস্যা অপশব্যা তনস্তামস্যাঃ অপহতা।'

এই অনুষ্ঠান ও মন্ত্রগুলির মধ্যে নারীর, বিশেষত বধূর সম্বন্ধে যে মনোভাব বিবৃত আছে তা হল: প্রথমত প্রকৃতির সৃষ্টি যে নারী, যে স্বভাবত অশুচি, অকল্যাণী, পুরুষপরতন্ত্র, হীন এবং কতকটা যেন ঊনমানব। বিয়ের অনুষ্ঠানের ও মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তার শুচিতা সম্পাদন করে বর তাকে নিজের, পরিবারের ও সমাজের জীবনে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। নইলে সে সংসার ও সমাজে অকল্যাণ আনবে; স্বামীকে হত্যা করবে, পুত্রদের হারাবে ও পশুর বিনাশের কারণ হবে। দ্বিতীয়ত, তার স্বতন্ত্র চিত্ত বলে কিছুই নেই বা থাকলেও না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তার স্বতন্ত্র চিত্তের অবনমন ঘটিয়ে সম্পূর্ণ স্বামীর চিত্তের অনুগামী, স্বামীর ব্রতের অনুব্রতা হওয়াই তার চূড়ান্ত কর্তব্য। তৃতীয়ত, স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির কল্যাণসাধনে সে আত্মনিয়োগ করবে। এতে দোষের কিছু থাকত না, যদি তার আপনি বাপের বাড়ির প্রতি কোনও কর্তব্য করবার কোনও সুযোগ বা অধিকার তাকে দেওয়া হত, অথবা তার স্বামীও তার শ্বশুরবাড়ি, অর্থাৎ বাধুটির বাপের বাড়ির সম্বন্ধে কোনও কর্তব্য সাধনের কোনও দায়িত্ব বোধ করত। বিবাহ অনুষ্ঠানে বধুর গোত্রান্তর এমনই আমূল এবং সর্বাত্মক, এমনই আত্যন্তিক যে তার পূর্বসত্তার প্রায় পূর্ণ

বিলোপ ঘটিয়ে তাকে–শুধু তাকেই—তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে একাত্ম হতে হত। চতুর্থত, স্বামীর জীবনে সে ধ্রুবা হবে। যেমন ধ্রুবা অরুন্ধতী: পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে, বন্ধু প্রতিজ্ঞা করবে স্বামীর জীবনে এবং শ্বশুরকুলে সে থাকবে পাথরের মতো স্থির অটল। লক্ষ্যণীয়, অনুরূপ কোনও প্রত্যাশা বরের সম্বন্ধে কোনও অনুষ্ঠানেই উচ্চারিত হয়নি। (৫)

একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিবাহের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক অবস্থানে নারীর এই রূপটিই স্বীকৃত: সে পুরুষের তুলনায় হীন, আর্থিক সামাজিক, ভরণপোষণ ও সুরক্ষার জন্যে স্বামী তথা শ্বশুরবাড়ির ওপরে একান্ত নির্ভরশীল ও আশ্রিত; কাজেই সে হবে স্বামীর ছায়ানুগামিনী। সব সমাজই আগাগোড়া এ ব্যবস্থা করেছিল যাতে সে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির মুখাপেক্ষিণী থাকে। এবং সমাজ এই আয়োজিত নির্ভরশীলতাকে ব্যবহার করেছিল তাকে অধীন রাখবার জন্য। আউরবাখের মতে পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ভূমিকার মধ্যেই নারীদের জীবনযাপন করতে প্রণোদিত করা হয়। (৬) মিলের চোখে নারীকে সর্বত্র চিরকাল বোঝানো হয়েছে যে, যেহেতু প্রকৃতিই তাকে দুর্বল ও পরাধীন করে নির্মাণ করেছে। অতএব স্বাধীন, স্বনির্ভর ভাবে বাঁচবার তার কোনও পথ নেই, অতএব বিবাহই তার একমাত্র গন্তব্য। (৭) নারীর হীনত্ব প্রতিপাদনে দৃঢ়পরিকর মনু বলেন, সর্বগুণহীন পুরুষও সর্বগুণযুক্ত নারীর পূজ্য। (৫:১৫৪) ওই উক্তি সম্ভব হল একটি উপপাদ্য মেনে নিয়েই: পুরুষ বলেই পুরুষের উৎকর্ষ, নারী বলেই ব্যক্তিগত গুণ, যোগ্যতা বিচারের কোনও মানদণ্ড এখানে স্বীকৃত নয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পুরুষের উৎকর্ষ, নারীর ও পুরুষের মনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধের মতো দৃঢ়প্রোথিত। অথচ কয়েক দশক ধরে নারীর স্বাধিকারবোধে প্রণোদিত যে আন্দোলন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে, শুধু তার মধ্যেই নারীর স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি।

নারীর এই হীনতার বোধ যেহেতু সমাজে বহুকাল ধরে পরিব্যাপ্ত সেই জন্যেই বিবাহের অনুষ্ঠানে ও মন্ত্রে এর প্রতিফলন। অতএব দুটি অসম মানুষের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়: উৎকর্ষ পুরুষের, ন্যূনত নারীর। দাম্পত্যেও এর দীর্ঘ ছায়া পড়ে। লোকচারেও এরই প্রতিবিম্ব। বিয়ে করতে যাওয়ার আগে বর ও তার মায়ের মধ্যে একটি সংলাপ প্রচলিত। বরসাজে সজ্জিত, যাত্রায় উদ্যত ছেলেকে মায়ের প্রশ্ন: 'কোথায় যাচ্ছে বাবা?' বর: মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।' তিনবার এই নাট্যাংশ অভিনীত হয়। শুধু যে বর, তার মা ও বাড়ির লোকেরা এটা বিশ্বাস করে তা-ই নয়, বধু ও তার বাড়ির লোকেরাও এটা বিশ্বাস করে, অর্থাৎ বাঁধুটি যে শ্বশুরবাড়ির দাসী এ বিশ্বাস বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি দৃঢ়ভিত্তি। আগেই বলেছি, অন্নবস্ত্রের জন্য বধূ স্বামীর ওপরে নির্ভরশীল। তাই দাসী-ভৃত্যের মতোই সে ভরণীয়া ভার্যা, তাকে খাওয়াতে হবে।(৮)

বাধুটির কন্যা অবস্থায় এই অন্নঋণ ছিল পিতার কাছে, ঋণী ব্যক্তি বন্ধক রাখা বস্তুর মতোই স্বাধীন নয়; তাকে দান করা যায় না। তাই বিয়ের আগে বাপের সঙ্গে মেয়েকে কনকাঞ্জলি নামে একটি নির্মম নাট্যাংশ অভিনয় করতে হয়। একমুঠো ধুলো বাপের হাতে দিয়ে মেয়ে বলে: 'সোনামুঠি নিয়েছিলাম, ধুলোমুঠি দিয়ে শোধ করলাম।' এ অনুষ্ঠান রূপকাশ্রিত, কারণ পিতার কাছে কন্যা ঋণমুক্ত না হলে তাকে সম্প্রদান করা যাবে না, তাই পিতৃকুলের ঋণ সে প্রতীকী ভাবে শোধ করে এমন মর্মন্তিক উচ্চারণে। এর মধ্যে নিহিত থাকে পিতৃকুল সম্বন্ধে তার সব দায়িত্বের অস্বীকৃতি। তিনদিন অশৌচ মেনে, চতুর্থীশ্রাদ্ধ করেই পাত্রান্তরিত বাধুটি মৃত পিতা বা মাতার সম্বন্ধে সব কর্তব্য সমাধা করে।

শ্বশুরবাড়িতে বধুবরণের সময়ে আঁকা লক্ষ্মী-পদচিহ্নে পা দিয়ে হেঁটে সে ঢোকে, দুধ উথলে পড়া দেখে, দুধে আলতায় দাঁড়িয়ে জ্যান্ত মাছ ধরে এবং

সেখানকার প্রশ্নের উত্তরে সে বলে শ্রীবৃদ্ধি উথলে পড়া দেখছে, কারণ এই তার দায়িত্ব–শ্বশুরবাড়ির সম্পদ বাড়িয়ে তোলা। বৌভাতের দিনে সে রোধে পরিবেশন করে শ্বশুরবাড়ির লোকদের ও অতিথিদেরঅন্তত এইটিই যথার্থ পাকস্পর্শের তাৎপর্য। সে দিন স্বামী তাকে এক থালা ভাত ও একখানা কাপড় দিয়ে তার সারা জীবনের অন্নবস্ত্র-সংস্থানের দায়িত্ব নেয়। বন্ধুটির পোষ্যতাই তার বশ্যতাকে বাধ্যতামূলক করে তোলে। তার অন্নসংস্থান করে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি, তাই পুরুষ, এ ক্ষেত্রে স্বামী, প্রাধান্য পায় দম্পতির অবস্থানে। বুঢ়াভেয়ার-এর কথায় যতক্ষণ স্বামী দম্পতির আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে ততক্ষণ তাদের মধ্যেকার এই (সাম্য) একটি অলীক ভ্রম মাত্র।(৯) উপার্জনক্ষম, বা বিত্তবান পরিবারের সন্তান যে স্বামী, সে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক, যা বাধুটি সেই অর্থে কখনওই হতে পারে না। পণ, যৌতুক, সৌদায়িক, স্ত্রীধন থাকা সত্ত্বেও দৈনন্দিন ভরণপোষণের ব্যাপারে যেযৌতু বধুটি স্বামী-শ্বশুরের মুখাপেক্ষী, তাই সে কখনওই স্বামীর মতো স্বয়ংসম্পূর্ব্ব বা স্বনির্ভর ব্যক্তি হতে পারে না।(১০) সামাজিক ভাবে পুরুষ স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ব্যক্তি।

অনুষ্ঠান সব সময়েই প্রতীকী। বিবাহের অনুষ্ঠানের প্রতীকগুলি অনুধাবন করলে বোঝা যায়, বন্ধুটি ভরণপোষণের পরিবর্তে স্বামী, শ্বশুর ও তাদের আত্মীয়পরিজনের পরিচর্যায় একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করবে–এইটেই আপেক্ষিত। কিন্তু কর্তব্য সবটাই একতরফা, নারীর কর্তব্যেই অবসিত এবং অধিকারও একতরফা পুরুষের। এইখানেই বৈষম্যের ভিত্তি, অশান্তির বীজ। বহু বিবাহে সংঘর্ষ আসে যখন বন্ধুটি তার বাপের বাড়ির জন্য কিছু করতে চায়। ওই যে শাস্ত্রে আছে বিবাহিত নারীর সমস্ত উপার্জনে তার স্বামীর অধিকার, এটাও লোকের মনে এত গভীর ভাবে প্রোথিত যে, আজ বাইরে কাজ করে উপার্জন করে যে মেয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে বাপের বাড়িতে

সাহায্য করতে পারে না; যদি বা করে, স্বামীর অনুমতি নিয়ে এবং কতকটা কুণ্ঠার সঙ্গে। আশার কথা, ব্যতিক্রম বাড়ছে এবং কিছু কিছু সদাশয় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছেন। আড়াই হাজার বছরের শাস্ত্র এবং বহু প্রাচীন লোকচার মিলে যে অধিসংগঠনটি বিবাহকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করেছে তা নেহাৎই একপেশে। তাই তা আজ এমন ভাবে টলে উঠেছে, কারণ মানুষের চেতনায় দীর্ঘকাল ধরে এই বৈষম্যে অস্বস্তি জন্মেছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, বহু সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ ও পরিবার চিরকালই সমাজে ছিল ও আছে এবং তারা এই বৈষম্যে পীড়া বোধ করেছে। শাস্ত্র যে বহু অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, লোকচারে যে বহু অনাচার নিহিত আছে সে বিষয়ে চেতনা ধীরে ধীরে বেড়েছে। ইদানিং বেশ কিছু পরিবারে দাম্পত্যকলহের হেতু শাশুড়ি সম্পর্কে বধূর সম্পূর্ণ উপেক্ষা, ঔদাসীন্য, কখনও কখনও ব্যবহারে অহেতুক রূঢ়তা, নির্মমতাও। বহু ক্ষেত্রে শাশুড়ি বধুটিকে উৎপীড়ন করেন এটা যেমন বহুকাল ধরেই সত্য, তেমনই বেশ কিছু পরিবারে, শ্বশুর শাশুড়িও উৎপীড়িত এও সত্য। বেশ কিছু শ্বশুর-শাশুড়ি সহায়সম্বলহীন পুত্রের পরিবারে আশ্রিত—-এ ক্ষেত্রে হয়তো আর কতকটা মানবিক বোধ নিয়ে সমাধান খুঁজলে ভাল হত। তেমনই দাম্পত্যে যদিও বহু সহস্রাব্দ ধরে বধুটি উনমানবের স্থানে থেকে অত্যাচারিত হয়ে এসেছে, তেমনই এখন বেশ কিছু সংসারে, স্ত্রীর প্রবল দাপটে স্বামী পীড়িত। বলাই বাহুল্য, দাম্পত্যের মূল রস-প্রেম— শুকিয়ে গেছে। তাই এক পক্ষের পুরুষ অহমিকা অবিচার ও অত্যাচারে পরিতৃপ্তি খুঁজছে। এও বহু সহস্রাব্দব্যাপী শাশুড়ির বধু নির্যাতনের প্রতিবাদ–ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রতিস্থিতি। কিছুকাল হয়তো চলবে, পরে ইতিহাসের নিয়মেই সংহতি আসবে, যখন বধু বা শাশুড়ি কেউই কাউকে নির্যাতন করবে: না; একত্রে বাস করতে হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি সূত্র নিজেরাই আবিষ্কার করবে। যেখানেই যে পক্ষই যার ওপরেই অত্যাচার করুক না কেন, সেটা অমানবিক এবং তা বন্ধ করা প্রয়োজন। দাম্পত্য দুটি

পরিবার ও দুটি ব্যক্তির সম্পর্কে জড়িত বলে এর নানা জটিল অনুষঙ্গ আছে, অতএব নীতিনিষ্ঠ মমতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হলে এ ধরনের জটিলতার গ্রন্থিমোচন সম্ভব।

_____

(১) ‘Marriage is a team game, and the couple, esp, the girl is kept out of ham’s way until the actual wedding day.’ Marriage and love in England p 293

(২) এহি অশ্মানমতিষ্ঠ অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। কৈশিকসূত্র (১০:৭৭)

(৩) আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (১.৭.২২)

(৪) মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমন্নু চিত্তং তেহস্তু।. বৃহস্পতিত্বা নিযুনক্তু মহাম। মানব গৃহ্যসূত্র (১.১০.১৩)

(৫) এ পর্যন্ত বিয়ের যে মন্ত্র ও অনুষ্ঠানগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হল সেগুলি দশকর্মের জন্য নির্দিষ্ট বাঙালির, ধর্মজীবনে সুপ্রচলিত ‘পুরোহিতদর্পণ’ গ্রন্থ থেকে উৎকলিত। ঈষৎ পরিবর্তিত ক্রম ও আকারে এগুলিই ভারতীয় হিন্দু বিবাহের বিভিন্ন পর্যায়ে ও অনুষ্ঠানে আচরিত হয়।

(৬) Women were exhorted to live in and through patriarchial family roles Women and the Denon, p. 61

(৭) ‘Marriage being the destination approved by society for women, and prospect they are borught up to…’ The subjection of ‘omen p. 246

(৮) মধ্যযুগ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে স্ত্রী স্বামীকে লর্ড' বলে সম্বোধন করত, এবং ভৃত্যও প্রভুকে ওই সম্বোধনই করত। এই লর্ড' শব্দটির বুৎপত্তি হল, half-ward, half অর্থাৎ loaf বা রুটির জন্যে যে নির্ভরশীল। স্ত্রী এবং ভৃত্য ও ব্যাপারে একই পর্যায়ে পড়ে। সংস্কৃতেও 'ভৃত্য' শব্দ নিষ্পন্ন ভূ' ধাতুর উত্তরে 'ক্যাপ প্রত্যয় দিয়ে, 'ভার্যা হয়। ভূ ধাতুতে 'ণ্যৎ প্রত্যয় দিয়ে। অর্থ একই, ভরণীয়।

(৯) ', as long as the man retains economic responsibility for the couple, this (equality) is only an illusion The Second Ser p. 498

(১০) A man is socially an independent and complete individual, ibid, p 447

ক্রীতদাসী

বিবাহ মানে এখন আমরা বুঝি ঐক্যদাম্পত্য (monogamy)–এক স্বামী, এক স্ত্রী। কিন্তু বহুপতিকতা আঞ্চলিক ভাবে এখনও আছে, প্রাচীন কালেও ছিল। আর বহুপত্নীকতা তো সে দিন অবধি বেশ জমাট ভাবেই ছিল, আইন করে বন্ধ করা হল। প্রাচীনকালে বিত্তবান ব্যক্তির বিজ্ঞাপন ছিল পশুসম্পদ আর পত্নীসংখ্যা। শাস্ত্রে যখন বলে, সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান যার পশুর সংখ্যা তার স্ত্রীর সংখ্যার চেয়ে বেশি।(১) তখন সহজেই বোঝা যায় স্ত্রীর সংখ্যা কত ছিল। সাম্প্রদায়িকতার ঝাঝে আজ বলা হয়ে থাকে মুসলমানের দুনীতির একটা প্রমাণ হল, সে চারটি বিয়ে করতে পারবে, যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি, খুব কম মুসলমানই চারটি স্ত্রীর স্বামী। এই সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট উক্তি

শুনলে প্রথমেই মনে হয়, কুলীন ব্রাহ্মণের তো চার স্ত্রীতে কুলোেতই না। বঁধানো খাতা তল্পিবাহকের হাতে দিয়ে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর বাড়িতে একরাত্রির অতিথি হয়ে শ্বশুরবাড়ির আতিথ্য, স্ত্রী-সম্ভোগ এবং যথাসম্ভব দক্ষিণা আদায় করে। পরবর্তী স্ত্রীর ঠিকানা খুঁজে সেখানে হাজির হওয়া–এই ছিল কুলীন ব্রাহ্মাণের জীবিকা। আইনের বলে এবং আর্থিক কারণে ঐক্যদাম্পত্যই এখন সমাজে বিবাহের একমাত্র রূপ।

গোষ্ঠী ও কৌম ভেঙে এল কুল' অর্থাৎ বৃহৎ যৌথ পরিবার, যেখানে একটি বিস্তৃত গৃহে বেশ কয়েক পুরুষ একত্র বাস করত, মনে হয় তখনই ঐকবিবাহ প্রবর্তিত হয়। তার বহু আগে বহু পুরুষ ও নারী একত্র বাস করত, দাম্পত্য ছিল ক্ষণস্থায়ী; সকল পুরুষেরই অধিকার ছিল কৌমের সকল নারীতে। পিতৃপরিচয় নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না; এমনকী প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগে যৌনমিলনের সঙ্গে সন্তান-জন্মের বৈজ্ঞানিক সম্পর্কটাই জানা ছিল না। এরই একটা রেশ থেকে গেছে মাতৃধারায় প্রবাহিত পরিবারের গঠনতন্ত্রে, যেখানে সন্তান মাতৃপরিচয়ে অভিহিত হত। যেমন মহাভারতের যুগেও দেখি কৌন্তেয়, মদ্রেয়, গাঙ্গেয়, রাধেয়,ইত্যাদির মধ্যে। মানুষ যখন সন্তান-উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক কারণটা জানত না তখন যেটা চোখে দেখতে পেত। সেটা হল মায়ের গর্ভ থেকেই সন্তান আসে। কাজেই পিতৃপরিচয় তখন ছিল অনুমানসাপেক্ষ, মাতৃপরিচয় একেবারেই স্পষ্ট, তাই মাতার পরিচয়ে পুত্রের অভিহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। তার অনেক পরে, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিল, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে কৃষিবাণিজ্যজাত সম্পত্তি সঞ্চিত হতে লাগল। তখন সম্পত্তিমান পিতার পরিচয়ে পুত্রের পক্ষে অন্য একটি তাৎপর্য বহন করতে শুরু করল।

ঐতিহাসিক ভাবে আদিম সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ছিল যৌথ: একটি প্রজন্মের সব নারী ও পুরুষেরই অধিকার ছিল সেই প্রজন্মের সব নারীর ও

পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে সম্পৃক্ত হওয়ার। পরের ধাপে বাদ যায় ভাই বোনের যৌন মিলন। (২) তার পরে, অনেক পরে এল ঐক্যদাম্পত্য; অন্য স্তরগুলির মতো এই স্তরেও সম্পর্কের নির্ণায়ক ছিল অর্থনীতি। সাধারণ যৌথ গোষ্ঠী কৌমের সমবেত পশুধনে গোষ্ঠী এবং/বা কৌমের সাধারণ অধিকারের স্তরে এক প্রজন্মের নারী পুরুষের সাধারণ সম্পর্কে ছিল। পরে ভ্রাতা ভগিনীর যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়। তার পরে যখন সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিল, তখন ধীরে ধীরে 'কুল' ভেঙে ঐক্যদাম্পত্য দেখা দেয় এক স্বামী ও এক বা বহু স্ত্রীর সংসার। এর পেছনে ক্রীতদাস বা দাসদের ভূমিকাও সক্রিয়। শ্রমসাধ্য কাজের ভার নারীর বদলে এসে পড়ল দাসের ওপরে। এতে নারী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সরে এসে পরিবারে ক্রীতদাসীর ভূমিকা নিতে বাধ্য হল। মিল বলেন, 'কোনও ক্রীতদাসই ততদূর পর্যন্ত এবং সম্পূর্ণভাবে ঠিক সেই ভাবে ক্রীতদাস নয়। যেমনটা স্ত্রী।'(৩) অন্যত্রও এমন কথা পাই; একশো বছরেরও বেশি আগে এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'সমবেত উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিতাড়িত হয়ে স্ত্রী প্রথমে গৃহদাসীতে পরিণত হল। গার্হস্থ্য দ্বারা প্রকাশ্যে বা ছদ্ম ভাবে নারীকে দাসীতে পরিণত করার ওপরেই বর্তমান ক্ষুদ্র পরিবার প্রতিষ্ঠিত। (৪)

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের পরে সমাজে যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে লাগল তার মধ্যে একটা হল এই যে, সম্পত্তিমানের নতুন একটা শিরঃপীড়া দেখা দিল; তার সঞ্চিত সম্পত্তি সে তার বৈধ উত্তরাধিকারীর জন্যে রেখে যাবে। বৈধ মানে ঔরস পুত্র! অবস্থার বিপাকে অন্য নানা রকম পুত্রও সম্পত্তিতে কম বেশি অধিকার অবশ্য পেত।' পুত্র নানা রকম হতে পারে। প্রধানত ঔরস: পিতার বীর্যেমাতার গর্ভেজাত। কানীন: কন্যাটির প্রাক্‌বিবাহ জীবনের সন্তান, যেমন কর্ণ। সহোঢ়: যে সন্তানকে গর্ভে নিয়ে কন্যার বিবাহ হল। গুঢোৎপন্ন: বিবাহের পরে গোপনে অন্য পুরুষের দ্বারা সঞ্জাত সন্তান। জারজ: স্বামীর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বামী ভিন্ন অন্য

পুরুষের সন্তান। পুত্রিকাপুত্র: অপুত্রক পিতা এই শর্তে কন্যার বিবাহ দিতেন যে প্রথম পুত্রটিকে কন্যার পিতা আপন পুত্র বলে গ্রহণ করবেন। ক্রীত: অর্থ দিয়ে অন্যের যে সন্তানকে ক্রয় করা হয়েছে। দত্তক: অন্যের সন্তানকে তার অনুমতিক্রমে আপন সন্তানের পরিচয়ে তার স্থলাভিষিক্ত করা। স্বয়মুপগত: যে বালক নিজেকে অন্যের কাছে বিক্রয় করে। পৌনর্ভব: নিয়োগের দ্বারা জাতবিধবার বা নিষ্প্রজ স্বামীর স্ত্রীর সন্তান। এত রকমের সন্তানকে সমাজ স্বীকার করেছিল, কারণ সমাজ চাক বা না চাক, এ সব সন্তান ছিল। কাজেই একটা সংহতির ব্যবস্থা করলে এদের সমাজের অভ্যন্তরে স্থান দেওয়া যায়। তা ছাড়া এ সবই পুত্রসন্তান এবং সমাজে পুত্রসন্তানের চাহিদা বরাবরই প্রবল।

এর মধ্য যে ছবিটা পাই তা হল দাম্পত্যের ভেতরে এবং বাইরে নানা ব্যতিক্রম। তথাকথিত নিষিদ্ধ সম্পর্কে যে সন্তান জন্মাত, তাকেও সমাজ নির্বাসন দেয়নি–যেমন কানীন, জারজ, সহোঢ় বা গুঢ়োৎপন্ন। কখনও বা আর্থিক কোনও কারণে ঐক্যবিবাহের সন্তান অন্যত্র স্থান পেত, যেমন, পুত্রিক পুত্র, দত্তক, ক্রীত, স্বয়মুপাগত, ইত্যাদি। মনে হয়, এতগুলি ব্যতিক্রমকে সমাজ যখন স্বীকার করছিল তখন তার মধ্যে কিছু সজীবস্থিতিস্থাপকতা ছিল। বিবাহিত জীবনের মূল ছকটা বহুপত্নীক অথবা একপত্নীক যাই হোক, তার বাইরে যে সন্তান এল তাকেও প্রয়োজনে ঠাঁই দিয়েছিল সমাজ। অর্থাৎ বিবাহই যৌনসম্পর্কের একমাত্র আশ্রয় ছিল না। নারীর ক্ষেত্রে কানীন, সহোঢ় এবং গূঢ়োৎপন্ন সন্তানকে মেনে নেওয়াতে সমাজ নারীর তথাকথিত ‘পদ-স্খলনকেই যেন কতকটা মেনে নিয়েছিল। প্রশ্ন উঠবে, কুন্তি তাঁর কানীন পুত্রকেও প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারেননি। এখানে তাঁর অল্পবয়স এবং রাজকন্যা পরিচয়ই হয়তো প্রধান অন্তরায় ছিল। সূর্য কর্ণের জনক এ কথা আক্ষরিক ভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়; তা হলে দাঁড়ায় প্রাসাদে দ্বিতীয় কোনও পুরুষের সংসর্গে জাত এই সন্তান—তাকে নিয়ে অপরিণতবয়স্ক তরুণী জননীর বিব্রত বোধ করাই স্বাভাবিক। ওই কুন্তিই কিন্তু বিবাহের

পরে স্বামী পাণ্ডুর নির্দেশে পাণ্ডুর অন্য তিনটি পুরুষের সংসর্গে তিনটি সন্তান ধারণ করলেন। এ চিত্রটা অন্য রকম: পাণ্ডু, সন্তান উৎপাদনে অক্ষম এবং সন্তানকামী, তাই এই নিয়োগ প্রথার ব্যবস্থা। এ প্রথা সে সমাজে প্রচলিত ছিল; ব্যাস সত্যবতীর বিধবা পুত্রবধু অম্বিক ও অম্বালিকাতে নিয়োগ প্রথা অনুসারে পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

যে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল, বিবাহ ও যৌনসম্পর্ক একাশ্রয়ী ছিলনা। নারী এবং পুরুষ উভয়েরই ভিন্ন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে সম্পৃক্ত হওয়ার কতকটা অবকাশ ছিল। একটা সময় তো নিশ্চয়ই ছিল, যখন কামনার বশে মিলনটা বিবাহ-সম্পর্ক-নিরপেক্ষ ছিল:

‘উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু। একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে উদ্যালকের স্ত্রীকে হাত ধরে সবলে টেনে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। তখন উদালক তাঁকে বলেন, এতে রাগ করার কিছু নেই। এ সনাতন ধর্ম; সকল বর্ণের নারীই অনাবৃতা–যে কেউ তাকে ভোগ করতে পারে। তখন থেকে নাকি শ্বেতকেতু নিয়ম করলেন, স্বামী বর্তমান থাকলে তার স্ত্রীকে কেউ যথেচ্ছ ভোগ করতে পারবে না।’

সেই থেকেই পত্নী পতিভোগ্য অর্থাৎ সমাজের বিশেষ কোনও অবস্থায় কোনও শাস্ত্রকার বা সমাজপতির অথবা ক্রমে ক্রমে বহু শাস্ত্রকারের নির্দেশে সমাজে ঐক্যদাম্পত্য যৌনসম্পর্কের একমাত্র সমাজস্বীকৃত বিধান হয়ে উঠল। ব্যতিক্রম হলে ভ্রূণ হত্যার পাপ হবে।(৬) তা হলে গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণ ভাবে গোষ্ঠীর সকল নারী পুরুষের সম্ভোগ অবাধ ছিল। এমন যুগক্রমে অচলিত হলেও এ প্রথার বেশ কিছু অবশেষ বর্তমান ছিল। পরবর্তীকালে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত। পরে ‘কুল’ যখন প্রধান হয়ে উঠল, তখন বহুপত্নীকতা ও

ঐক্যবিবাহ প্রচলিত হল। এইটিই মোটামুটি দাম্পত্যের ছক হিসেবে চলে এসেছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে।

কোনও সমৃদ্ধিমান পুরুষের সমৃদ্ধির একটি বিজ্ঞাপনই হল বহুপত্নীকতা। এই বোধের অন্তরালে সক্রিয় নারীর ভোগ্যবস্তু পরিচয়। ধনরত্ন, পশুপালের সংখ্যা যেমন সমৃদ্ধির বিজ্ঞাপক, তেমনই বহুসংখ্যক স্ত্রীও সমাজে আর্থিক প্রতিষ্ঠার একটি পরিচয়। প্রাচীন শাস্ত্রে শুনি, পত্নীরা হল। সমৃদ্ধির রূপ। ' এ দেশে কুলীন ব্রাহ্মণের বহুপত্নীকতার পেছনে সমৃদ্ধির বিজ্ঞাপন ছাড়াও সমৃদ্ধি উপার্জনেরও একটা দিক ছিল, এবং কৌলীন্য সম্বন্ধে বাকি ব্রাহ্মণকুলের অসুস্থ, বিকৃত লোলুপতা এই অমানবিক প্রথাকে দীর্ঘজীবন দিয়েছিল। বৃদ্ধ শ্মশানযাত্রী কুলীনের সঙ্গে বালিকা কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, কুলীন জরৎকুমারীর বিবাহ দিয়ে কন্যার পিতা পুণ্য অর্জন করতেন। মনে রাখা ভাল, নারী এ ধরনের বিকৃত সমাজবোধের বলি অন্য দেশেও হত। ইউরোপে যাকে 'রাজপরিবারের বিবাহ' (dynastic marriage) বলা হত তার বলি হত। অনেক অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরী। তফাৎ শুধু একটাই, শাস্ত্রে তার সরাসরি সমর্থন মিলত না; এখানে এই নৃশংস প্রথার পেছনে শাস্ত্রীয় সমর্থন ছিল। তবে সুখের বিষয়, এ সব শাস্ত্রও অর্বাচীন, মোগল যুগের শেষ দিকের রচনা এবং এ প্রথার পরমায়ুও কয়েকশো বছর মাত্র। কিন্তু এই ধরনের বহুবিবাহ ও অসম-বয়সের বিবাহ এবং নামমাত্র বিবাহ, এগুলি পুরুষের অনুকূলে সৃষ্ট প্রথা, এর মধ্যে নিহিত আছে দাম্পত্যের এবং নারীর অপমান। এগুলি শুধু শাস্ত্রসমর্থিত নয়, ওই কয়েকশো বছর ধরে ব্রাহ্মণ সমাজে বহুল আচরিত প্রথা। সহমরণ প্রথায় বহু নারীর তাৎক্ষণিক মৃত্যু যেমন এক অমানবিক নৃশংস প্রথা ছিল, কৌলীন্য ও বহু বিবাহেও তেমনই ছিল নারীর সত্তার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি এবং তার ওপরে অন্যায় অত্যাচার। এগুলি যদি দাম্পত্যের প্রহসন না হত তা হলে এ প্রসঙ্গই এখানে উঠত না। এ কথা ভুললে চলবে না যে, বেশ কয়েক শতক

ধরে, কৌলীন্যপ্রথার অন্তর্নিহিত নারীর অপমান সমাজ মেনে নিয়েছিল। কুলীন কন্যাৱ পিতা পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হত। তার কন্যাকে যখন বৃদ্ধ, মুমূর্ষু, পঙ্গু, বহুবিবাহিত, লম্পট, কামুক, অর্থলোভী কুলীনের হাতে সমর্পণ করে নিজের পরলোক নির্বিঘ্নে করত; কন্যাকে তখন সে দায় ও বস্তু বলেই গণ্য করত। সে কন্যার যে নিজের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে কোনও প্রত্যাশা থাকতে পারে এমন চিন্তা কদাপি তার পিতাকে পীড়িত করত না। এ দেশে দাম্পত্যের অবনমনের এ একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এমন কোনও বিবাহ-সম্পর্কিত প্রথা এখানে ছিল না যাতে পুরুষের পুরুষত্ব এ ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। সমস্ত কুপ্রথার দণ্ড দিতে হয়েছে। নারীকে, সুখী দাম্পত্যে যার সহজাত অধিকার ছিল।

এখন বহুপত্নীকতার বিরুদ্ধ আইন থাকায় একবিবাহই দাম্পত্যের প্রচলিত চেহারা। আমাদের আলোচনার বিষয় এই বিবাহ। মনে রাখা দরকার, এখন সমাজে বিয়ে হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে অথবা রেজিস্ট্রি করে; আনুষ্ঠানিক বিয়েতেও আজকাল রেজিস্ট্রেশন চালু হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তার জন্যে। যে ভাবেই হোক, এখনও শতকরা নকবইটি ক্ষেত্রে বিয়ে ঠিক করে কন্যাপক্ষ ও পত্রপক্ষ। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কৃষিজীবী পরিবারে প্রায় সর্বদাই এ ভাবে বিয়ে ঠিক হয়। শ্রমিকের ক্ষেত্রে এবং একবারে নিম্নবিত্ত চাষির ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম থাকে। ব্যতিক্রম কিছু উচ্চ ও মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রেও ঘটে, মাঝেমাঝেই পাত্রপাত্রী নিজেরা বিয়ের ঠিক করে, কখনও প্রেমের জন্যে, হয়তো তার চেয়ে বেশি সংখ্যাই হবে যাদের কাছাকাছি আসার ভিত্তি শুধু ভাল-লাগা। ভাল-লগা থেকেও প্রেম জন্মাতে পারে, নাও পারে। আবার প্রেম দিয়ে যার শুরু বিরূপতা বিদ্বেষ দিয়েও মাঝে মাঝে তার শেষ হয়। সম্বন্ধ করে যে বিয়ে তাতেও ভালবাসা জন্মাতে পারে, জন্মায়ও অনেক ক্ষেত্রে; আবার দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের প্রান্তে এসে দু'পক্ষই পরস্পরের কাছে স্বল্প পরিচিত দুটি

ব্যক্তি থেকে যায় মাত্র, একে অন্যের প্রেম পায় না, চিত্তের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। অর্থাৎ দুটি মানুষের কাছাকাছি আসা বা একত্র বাস করার মধ্যে বিবাহিত দুটি মানুষের মধ্যেও ঘনিষ্ঠতার, আবেগের ও অনুরাগ-বিরাগের নানা স্তর থাকে। তারা যে পরস্পরকে কতটা জানবে, মানসিক ভাবে কতটা আপন করে পাবে সে বিষয়ে কোনও স্থির নিশ্চয়তা নেই।

_____

(১) সমৃদ্ধং যস্য কানীয়াংসো ভার্যা আসন ভূয়াংসঃ পশবঃ। শতপথব্রাহ্মণ (২:৩:২:৮)

(২) সম্ভবত ঋগ্বেদের যম-যমী সংলাপের মধ্যে এই নিষেধের একটি ইঙ্গিত বিধৃত আছে। ঋগ্বেদ (১০:১০)

(৩) No slave is a slave to the same lengths and in so full a sense of the word, as a wife is The Subjection of Women, p. 148

(৪) ‘The wife becomes the first domestic servant pushed out of participation in social production, the modern, individual family is based on the open or disguisded enslavement of the woman.’ Origin of Family. Private Property and the State, p. 211

(৫) মহা. (১.১১১.২৮-২৯)

(৬) মহাভারত (১:১১৩:৯-১৮)

(৭) শ্রিয়া বা এতদ্রূপং যৎ পত্ন্যঃ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩:৯:৪:১৯)

সম্পর্ক

তা হলে প্রশ্ন আসে, বিবাহ কী ভাবে হওয়া উচিত? অনুষ্ঠান বা রেজিস্ট্রির প্রশ্ন নয়–দুটি মানুষের একত্র বাসের জন্য নির্বাচনের ভিত্তি কী হওয়া উচিত? এখন পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি পরিবারের সামাজিক আর্থিক নিরিখ দিয়েই মূলত এই নির্বাচন হয়। এই কিছু দিন আগে পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশেও এই নিরিখ চলিত ছিল। বিবাহে সঙ্গী/সঙ্গিনী নির্বাচন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হত প্রেম বা স্নেহ দিয়ে নয়, বরং পরিবারে নির্ভরশীল আশ্রিতদের দেখাশোনার জন্যে সামাজিক ও আর্থিক প্রয়োজন দিয়ে এবং পারিবারিক বাণিজ্য বা শিল্পকে চালিয়ে দিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়ে।'(১) সে দেশে জাতিভেদ ছিল না, কিন্তু বিত্তকৌলীন্য ও বংশমর্যাদার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেই বিত্তবানের পরিবারে বিবাহ নিষ্পন্ন হত। এ দেশে বাড়তি অভিশাপ হল জাতিভেদ। বিদ্যাবুদ্ধি, যোগ্যতা, স্বভাব, রুচি সব মিললেও বহু ক্ষেত্রে বিবাহটি ঘটতে পারে না, পাত্রিপাত্রীর জাতে মিল নেই বলে। এখনও খবরের কাগজে 'পাত্রপাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনে শুধুমাত্র তফসিলি বা তথাকথিত নিম্নবর্ণের পাত্র-পাত্রীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, 'অসবর্ণ চলিবে; অর্থাৎ সামাজিক অধিরোহণের পথটা খোলা থাকে, যাকে চলতি ভাষায় বলে জাতে ওঠা'। হয়তো হাজারে একটি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ পত্রপাত্রীর ক্ষেত্রেও 'অসবর্ণে বাধা নাই।' দেখা যায়। আসলে এই বাধা থেকে যারা মানসিক ভাবে মুক্ত তারা বেশির ভাগই নিজের পছন্দে বিয়ে করে, বিজ্ঞাপন দিয়ে নয়।

বিয়ের ব্যাপারে পাত্রপাত্রীর মতামত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অগ্রাহ্য করা হয়। মোটা দাগের কিছু চাহিদা, যেমন ফরসা চাই, বেশি লম্বা নয়, গ্র্যাজুয়েট চাই,

গান-জানা চাই, ইত্যাদি হয়তো গুরুজনেরা কখনও কখনও মনে রাখেন, সর্বদা নয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এমন ঘটেছে যে তাদের চাহিদা, বংশ, জাত, দেনাপাওনা, উচ্চপদ, ইত্যাদি মিললেও পাত্রিপাত্রীর পছন্দ গৌণ হয়ে উপেক্ষিত হয়েছে। এ সব দাম্পত্য শুরুই হ্রয় মনের একটা চাপা নালিশ দিয়ে, যে-নালিশ প্রকৃতপক্ষে তাদের মা-বাবার বিরুদ্ধে। তাদের খেয়ালের দেনা শোধ করে বর বা বধূ, বা উভয়েই। কখনও এ নালিশ উচ্চারিতও হয় না, শুধু অতৃপ্তি জমিয়ে তোলে জীবনভর। আবার কখনও অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ থাকলে নালিশও কখন মিলিয়ে যায়।

বিবাহোত্তর জীবনে দাম্পত্যকে নানা সমস্যা পেরিয়ে এগোতে হয়। দুটি মানুষ তো বিচ্ছিন্ন দুটি দ্বীপ নয়। বর, বধু উভয়েরই পরিবার আছে। সেখানে সকলেই যে আগন্তুককে আন্তরিক স্বাগত জানায়, তা নয়। এবং নতুন জীবনে প্রবেশের মুখে দুটি প্রাপ্তবয়স্কের চেতনায় প্রায়ই যে সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা দেখা দেয়, তাতে খুব দ্রুত ধবা পড়ে আন্তরিক অভ্যর্থনার অভাব। রূপ, গুণ, স্বভাব, সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য, বংশ, দেনাপাওনা এগুলো পরিবারের তথা তৎসংলগ্ন সমাজের প্রত্যাশার সঙ্গে না মিললে প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় মৃদু গুঞ্জন, এবং অচিরেই তা মৃদুতা হারিয়ে, সরব এবং কটু হয়ে ওঠে। অবশ্যই, এর বড় ধকলটা সইতে হয় বাধুটিকে। একে, তার জীবনে অন্য একটি মানুষকে মেনে-নেওয়ার পালাটি তখন চলছে, তার ওপর ঝাপটা এসে লাগে সেই মানুষটির আত্মীয়-পরিজনের অসমর্থন, বিরূপতা, সমালোচনায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মূল আশ্রয়স্থল যে মানুষটি, সে তাকে এ সময়ে মানসিক আশ্রয় দেয় না, বধূর যে অন্যায় সমালোচনা তার পরিবারে চলে তার প্রতিবাদ করে না। করাটা সে দুরূহ মনে করে, কারণ তার আবাল্য পরিচিত আত্মীয়-পরিজন তাতে ক্ষুন্ন হয়ে তাকে স্রৈণ ভাববে, অসভ্য মনে করবে। কিন্তু নবাগত বাধুটির মানসিক স্বস্তির জন্যে তার যে দায়িত্ব আছে,

সে কথা মনে করে সে অন্তত কিছুকালের জন্যেও পরিবারের অশ্রীতিভাজন হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবিটা এই রকমই। মেয়েটি মনে মনে তাকে কাপুরুষ ও অবিচারের সমর্থক মনে করে তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারায়–যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা দাম্পত্যের একটি দৃঢ় ভিত্তি। বহু ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই উৎসব হইচই মিটে গেলেই একটি অসহায় মেয়ে, তার স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ না পেয়ে ভেতরে ভেতরে বিমুখ হয়ে ওঠে। মজা হল, সম্বন্ধ করে অর্থাৎ দু'পরিবারের পাত্রপাত্রী পছন্দের র্যাপারে যে সব বিয়ে হয়। সেখানেও এমন 'খুঁত' বের করা হয় যা সত্যিই অযৌক্তিক। নতুন মানুষটিকে সাদর স্বাগত জানানোর বদলে বহু ক্ষেত্রে তাকে প্রচ্ছন্ন শত্রুজ্ঞানে কেবল বিচার করে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। যেন প্রত্যাশা ছিল মেয়েটি নিখুঁত, সর্বংসহা ও সর্বগুণসম্পন্না হবে। এ ধরনের কোনও প্রত্যাশা বরের সম্বন্ধে সমাজে বা পরিবারে থাকে না, কারণ সে পুরুষ। শোনা যায়, 'সোনার বাটি, তার আবার চেহারা দেখা'। এমন ধরনের বিবাহে দাম্পত্য গড়ে ওঠার আগেই তার ভিত ভেঙে যায়, যদি না স্বামীর প্রশ্রয় সমর্থন স্পষ্ট ভাবে স্ত্রীকে রক্ষণ করে।

দেনাপাওনার ব্যাপারেও বারে বারে দেখা যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছেলে এ ব্যাপারে ব্রজেশ্বর হয়ে ওঠে; বাবা যা ভাল বোঝেন, করবেন ও বিষয়ে আমি কোনও কথা বলব না। বস্তুত, সে-ও জানে নিজে দেনাপাওনার কথা বললে শুধু দৃষ্টিকটু হবে তাই নয়, দরদরি মাঝপথে ভেস্তে যেতে পারে, পক্ষান্তরে বিষয়ী বাবা ওটা দেখলে প্রাপ্তিযোগটা বেশি হওয়ারই সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য, যে মেয়েটির বাবাকে এই দণ্ডটা দিতে হচ্ছে সেও এতে প্রসন্ন হতে পারে না, কারণ এখানেও ভাবী স্বামীর নীরবতা যে প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতাই, সেটা সে বেশ বুঝতে পারে। এ তো সবে কলির সন্ধে; প্রাপ্তির স্বাদ-পাওয়া শ্বশুরবাড়ির

লোভা চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে চলে। বেড়ে চলে বধূ ও তার বাপের বাড়ির কাছে দামি জুলুম, এবং দাবি না মেটালে বাধূটির ওপরে অত্যাচার। সে অত্যাচার কখনও সমাপ্ত হয়। অগ্নিদাহে, বিষে বা অন্য অপঘাতে। কখনও পথ না পেয়ে মেয়েটি আত্মঘাতিনী হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব একটি টেলিফোন সংলাপ— দৈবাৎ দূরভাষজটে সংলাপটা মিনিট দুয়েক শুনতে হয়। আলাপটার শেষ মিনিটে ছিল প্রেমালাপের উপসংহার। ছেলেটি বলে, 'তা হলে আর দেরি করে কী হবে? কালই আমি যাই তোমার বাবার কাছে তাঁর মত চাইতে।'

মেয়েটি আতঙ্কিত স্বরে বলে, 'খবরদার, অমন কাজও কোরো না। মত চাইতে গেলে শুধু মতটাই পাবে আর কিছু নয়। গত অস্ত্রাণেই সেজদির বিয়েতে বাবা সাঁইত্রিশ হাজার টাকা খরচ করলেন। মত চাইলে এ সব কিন্তু পুরো ফাঁকি দেবেন।'

শুনে খুব হতাশ লাগে। এরা গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। প্রেমের বিয়ে, কিন্তু প্রাপ্তিযোগের হিসেবটা খুব মজবুত। মেয়েদের এখনও মেরুদণ্ডে সে জোর এল না যে বলে, 'যে-মানুষ আমার সঙ্গে পণও চাইবে তার ঘরে আমি যার না।' ছেলেদেরও চেতনা জন্মাল না যে বোঝে 'পণ' কথাটার মানে দাম, অর্থাৎ মেয়ের বাবা জামাইকে টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছেন। মেয়েরা কেন বলতে পারে না, 'কেনা মানুষের সঙ্গে বাস করতে পারব না?' ছেলেরাই বা বলতে পারে না কেন, 'পণ্যদ্রব্য হতে রাজি নই?' আসলে ওই লোভ। উভয়তই। অনর্জিত বস্তু ও বিত্ত ভোগ করার মধ্যে যে অসম্মান অন্তর্নিহিত আছে তা টের পাওয়ার মতো আত্মসম্মানবোধই জন্মায়নি অথবা লোভের চাপে তা গৌণ হয়ে গেছে।

সদ্যবিবাহিত বান্ধবীদের মধ্যে যৌতুকে পাওয়া বস্তু-সম্ভারের সুতৃপ্ত আলোচনায় যে আত্মপ্রসাদের সুর লাগে তা শুনে বিবমিষা জাগে। এটা আপাত ভাবে পিতার বিত্তকৌলীন্যের গৌরব সূচনা করে। কিন্তু তা ছাড়াও এর মধ্যে আছে শ্বশুরবাড়িতে প্রত্যাশিত অভ্যর্থনা, প্রতিবেশীদের ঈর্ষা উদ্রেক, পরিজনদের তাক লাগিয়ে দেওয়া, বান্ধবীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং স্বামীর কাছে নিজের আর্থসামাজিক বাজারাদরের ঘোষণা। এর প্রত্যেকটিই এক নীচ অশালীনতার দ্যোতক। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা শুধু যে এর থেকে মুক্ত নয়। তাই নয়, বরং ক্ষোভের কথা হল এই যে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে সমাজে এ হীনতা ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে। দাম্পত্যের ভিত্তিতে লোভের এই ক্লেদ থাকলে তা কখনওই সুস্থ ও নির্মল হয়ে উঠতে পারে না। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। নিম্নমধ্যবিত্ত একটি ছাত্রীর বিবাহ সামাজিক ভাবে সমপর্যায়ের, উন্নতমনস্ক ও পূর্বপরিচিত একটি তরুণের। সে মেয়েটিকে বলে, বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে কোনও কাপড় গয়না, আসবাব বা তৈজসপত্র যেন সে কিনতে না দেয়। যুক্তি দেয়, 'আমিও তো বিয়ে করছি, কই আমি তো আমার বাবা-মাকে পীড়ন করছি না, তুমি কেন করবে? আমরা চাকরি করে আস্তে আস্তে যে সংসার গড়ে তুলব। তাতেই আমাদের যথেষ্ট হবে। পীড়ন শোষণের ভিত্তিতে কোনও ভাল জিনিস গড়ে উঠতে পারে না। মেয়ের বাড়ির থেকে স্বেচ্ছায় যা দিতে তাঁরা উদ্যত ছিলেন তাও নিতে অস্বীকার করে ছেলেটি। তার যুক্তি: তার বাড়ি থেকে তো অনুরূপ কোনও দানসামগ্রী মেয়ের বাড়িতে আসছে না। কুড়ি বছর আগে এই বিয়েতেই পাত্রপাত্রীপক্ষ এক সঙ্গে একটি সাদাসিধে সুরুচিপূর্ণ নৈশভোজনের আয়োজন করেন। নানা দিক থেকেই এঁরা একটি আদর্শস্থাপন করেন, সমাজে যা প্রচলিত হলে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হতে পারে।

দাম্পত্য জীবন যদি যৌথ পরিবারে কাটাতে হয় তা হলে পরিবারে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের মন্তব্য নিয়ে অশান্তি দাম্পত্যের সুখশান্তি নষ্ট করে। যদি শ্বশুরবাড়িতে বাধুটি মানবিক ব্যবহার পায়, তা

হলে, দম্পতিটির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ভাল থাকলে, শান্তি থাকে। কিন্তু প্রতিবেশীদের প্রতিক্রিয়া বিরূপ হলে তার প্রভাবও দম্পতির জীবনে প্রতিঘাত সৃষ্টি করে। প্রতিবেশীদের মারফতে সামাজিক প্রতিক্রিয়াও এসে পৌঁছয় এবং তার প্রতিকুল হলে শান্তি নষ্ট হয়। প্রতিবাসীরা সমাজের প্রতীক, যে সমাজকে অদৃশ্য থেকে অন্তরাল থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে রাষ্ট্র। বিত্তকৌলীন্য, পুরুষতন্ত্র, বর্ণবৈষম্যের মূল্যবোধে রাষ্ট্রের নির্মাণ; এবং এই সব যেন কায়েম থাকে, সে ব্যবস্থা সে নেপথ্য থেকে আইন, সাহিত্য, গণমাধ্যম সব দিয়েই প্রতিষ্ঠা করে।

সমস্যার মৌলিক উৎপত্তিস্থল দম্পতির একান্ত ব্যক্তিগত মানসিক সম্পর্কে। দুজনের শিক্ষাদীক্ষার মানে (প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে নয়)। যদি দুস্তর ব্যবধান থাকে। তবে তা মানসিক সাহচর্যের পথে অন্তরায় হতে পারে। তেমনই অথবা হয়তো তার চেয়েও বেশি দুরতিক্রম্য হল রুচির ব্যবধান। একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে আধুনিক সঙ্গীত একেবারেই সহ্য করতে পারে না, অপরজন ঠিক তার বিপরীত। এ ক্ষেত্রে দাম্পত্য হয়তো ভাঙে না কিন্তু যতটা মানসিক সাযুজ্য হতে পারত তা হতে পারে না। এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর হল স্বভাবে গরমিল।

'তেতাল্লিশ বছর একত্রে সংসার করার পর এক বৃদ্ধা গৃহিণী প্রতিবেশীর কন্যার কাছে চোখ মুছে বলছেন, 'চারটে পয়সা কখনও কাউকে হাত তুলে দিতে পারিনি। টাকপয়সা সব ওর কাছে। প্রতিটি পাইপয়সার হিসাব আছে। মরণাপন্ন মায়ের অসুখে চিকিৎসার খরচ কিছু দিতে পাইনি। আমার ভাই নেই তা উনি জানেন, বাবা তার শেষ কপর্দক দিয়ে মায়ের চিকিৎসা করেছেন; চিঠি পড়ে বলতে গেলুম, 'কিছু সাহায্য করি?' বললেন, 'ও বাড়ির দায় তোমার নয়। তোমাকে তো শাড়ি গয়না দিয়ে আরামে রেখেছি, তোমার মা বাবার খরচা দেওয়া আমার দ্বারা হবে না।' ঠাকুরকে বলি, একে এত ধন দিলে, মনটা কেন দিলেন না, ঠাকুর?'

এই শোক নিষ্প্রতিকার। ভদ্রমহিলা দুঃখীর দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না। অথচ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জীবন কাটালেন। কার্পণ্য ও উদারতার সংঘাত খুবই মর্মন্তিক। শাস্ত্র এবং সমাজনির্দেশ অনুসারে বৃদ্ধের কোনও দায়িত্ব ছিল না ঠিকই, কিন্তু মানবিকতার ক্ষেত্রে যে দুস্তর ব্যবধান তা শাড়ি গয়নায় ঘোচেনি। সেই বৃদ্ধার অশ্রুপাত একার নয়, এমন বহু দম্পতি দেখা যায় যাঁরা এই ধরনের মানসিক বৈষম্যের ফলে সারা জীবন দুঃসহ কষ্টে কাটান। এ ছাড়াও আছে আদর্শগত ব্যবধান। একজন হয়তো কোনও রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী, অন্যজন তার বিপরীত পন্থার অনুগামী, কিংবা দেশ বা সমাজে কল্যাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এ অবস্থায় একের ঔদাসীন্য অপরকে তার সত্তার খুব গভীর স্তরেই আঘাত করে, কিংবা দুই বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত দুজনকেই করে। এ ধরনের বৈষম্য উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষত যদি দুজনের বা একজনেরও আদর্শে বিশ্বাসটা আন্তরিক হয়, তার জীবনের তাৎপর্যবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে জড়িত থাকে। এগুলো বেশির ভাগই ঘটে সম্বন্ধ করা বিয়েতে। বিয়ের আগে দুজনের কিছুকাল আলাপ পরিচয় থাকলে এ ধরনের দুস্তর ব্যবধানে হয় দু'পক্ষ দূরে সরে যায় অথবা যদি সম্ভব হয় তো একে অন্যকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে স্বমতে আনতে পারলে ব্যবধান আর থাকে না। অবশ্য বিয়ের আগের মতবাদও পরিবর্তিত হতে পারে, দম্পতির অন্য জন সে পরিবর্তনকে অন্তরে স্বীকার করতে না পারলেও দেখা যায় সংঘাত।

বেশ বেশি সংখ্যায় বিয়ে ভাঙে আর্থিক কারণে। অভাবে, অথবা প্রত্যাশিত সচ্ছলতার অভাবে। আজকের দিনে আয় সে অনুপাতে বাড়ছে না এবং সন্তানসন্ততি এলে প্রত্যাশিত ভাবে পারিবারিক ব্যয়ভার দুর্বাহ বোধ হচ্ছে। এমন অবস্থায় দেখা দেয় পরস্পরকে দোষ দেওয়ার প্রবণতা। প্রথমে আয় বাড়াবার চেষ্টা, তা ব্যর্থ হলে ব্যয়সংকোচের প্রয়াস এবং বর্তমান পৃথিবীতে যেহেতু সমস্ত গণমাধ্যমই ব্যয়বাহুল্যের রাস্তাই বাতলে চলেছে, তাই অচিরেই

দু'পক্ষই যেন দেখতে পায় ব্যয়সংকোচের পথটা একটা কানাগলিতে গিয়ে ঠেকেছে। এর ওপরে আছে, প্রতিবেশী ও পরিচিত পরিবারগুলির জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে, চেতনে অথবা অবচেতনে, নিজেদের অবস্থার একটা তুলনার প্রয়াস: প্রায়শই নিজেদের জীবনযাত্রার মান, অত্যন্ত উচ্চবিত্ত বাদে আর সকলের ক্ষেত্রেই যে ক্রমাগতই নেমে যাবে এই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াটিকে স্বরূপে বোঝবার মতো মুক্ত দৃষ্টি বেশি জনের থাকে না। বাকিরা ক্রমবর্ধমান অভাবের অন্ধ গলিতে মাথা ঠোকে ও মনে মনে বা প্রকাশ্যে একে অপরকে পরিবারের অর্থনৈতিক মানের অবনমনের জন্য দোষ দেয়। আর মুক্ত দৃষ্টিতে বুঝলেও তো সত্যিকার অভাব থেকেই যায়। বিশেষত কালো টাকার হঠাৎ-নবাবদের অবিশ্বাস্য আয়বৃদ্ধির দিনে, যখন তারা দেখে, চারপাশের কিছু লোকের গায়ে অভাবের আঁচটিও লাগছে না, আটশো টাকা কিলোর মাছও তারা অনায়াসে নিয়মিত ভাবে কেনে। বিদেশি মদ বা প্রসাধনদ্রব্য, সেলুলার-ফোন, টেম্পল শাড়ি বা বিদেশি গাড়ি এবং দূর বিদেশে ছুটি কাটানো যেহেতু তাদের কাছে সহজ হয়ে গেছে, তাই সেই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে নিজেদের অভাব যেন অহেতুক ক্রুরতার চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। হঠাৎ-নবাবদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার প্রবৃত্তি নিজের অপ্রতিকার্য অভাবকে আরও দুঃসহ করে তোলে। আদর্শগত কোনও স্থৈর্য বা স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার সহজাত বা সাধনায় আয়ত্ত-করার ক্ষমতা যার নেই, এই পরিবেশে তার মর্মপীড়া বাড়বেই। এই আর্থিক ক্লেশের দিনে বহু দাম্পত্যে চিড় ধরতে দেখা গেছে। দুজনের মধ্যে সহমর্মিতা যদি এমন গভীরে না পৌঁছয় যেখানে বাইরের এই সব ঝড়ঝাপটা এসে দাম্পত্যের ভিত্তিতে না লাগে, তা হলে অকারণে ভুলবোঝাবুঝি শুরু হয় ও ক্রমাগত বেড়েই চলে। স্কুল জীবনযাত্রাকে পেরিয়ে গভীরে কোনও এক জায়গায় দাম্পত্য সম্পর্কের নোঙর থাকলে তবেই এই সব ঝড় সওয়া যায়।

যৌনতা

বিবাহই একমাত্র সম্পর্ক যেখানে রক্তের সম্পর্কে সম্পৃক্ত নয় এমন দুটি মানুষ একটি মিলিত জীবনের সূত্রপাত করে। এ ছাড়া এই সম্পর্কের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে: এই একটি মাত্র সম্পর্কের শিকড় হল যৌন মিলনে। গাছ যেমন তার শিকড়কে মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন রাখে, প্রত্যক্ষ থাকে তার কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পাতা; এবং সেই অদৃশ্য গভীর থেকে রস সংগ্রহ করে ওপরের শাখায় সে ফুল ফোটায়, ফল ফলায়, তার শাখায় ও কোটরে পাখি ও অন্য প্রাণীকে আশ্রয় দেয়, দুটি মানুষের মিলিত জীবনেও এই ব্যাপারটা অমনি চেহারা নেয়। তাদের মূলে যৌন সম্পর্ক থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে; তাদের সংযুক্ত জীবনের শ্রী ও সার্থকতা প্রকাশ্য দৃষ্টিগোচর; তাদের রচিত সংসার-নীড়ে অন্য মানুষ প্রশ্রয় পায়। কর্মে, ত্যাগে, সৌন্দর্যে, আদর্শে তাদের দাম্পত্য সার্থক হয়ে ওঠে। সন্তানে ফলধারণ করে, মনুষ্যজাতির জীবনকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রলম্বিত করে। কিন্তু যেহেতু এই একটি মাত্র সম্বন্ধের ভিত্তি যৌনসম্পর্কে, তাই এর নিজস্ব কিছু শারীরিক সমস্যা থেকে যায়। এ সব মিটিয়ে যখন যুগ্মজীবন শুরু হয় তখনও আগন্তুক উৎপাত, সমালোচনা, পারিবারিক নানা সমস্যায় দাম্পত্য জীবন বিঘিত হতে পারে।

একটি সমস্যা হল সন্তানজন্ম সম্পর্কে। এ দেশে বহু পরিবারে সন্তানজন্মটা আপতিক, তার কোনও মানসিক পূর্বপ্রস্তুতি থাকে না। এবং প্রায়শই এটা মায়ের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত, চাপিয়ে দেওয়া। আগন্তুক সন্তানটির জন্য তার সম্মতি বা সংগ্রহ প্রতীক্ষণ থাকে না। বহু ক্ষেত্রে বিশেষত, দুঃস্থ পরিবারে শাশুড়ি ও শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ির অন্যান্য লোকেরা তুরীয় ভাবে বলে থাকে, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। বোঝা সহজ, উক্তিটির পেছনে কোনও বিশ্বাস নেই, বিশ্বাসের ভিত্তিও নেই; জীবটির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে খিদে ও অনাহারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। আহার দেবার তাগিদ কোনও উপরওয়ালার থাকে না। এবং বাবা মা-র ইচ্ছা থাকলেও ক্রমবর্ধমান সন্তানকুলের খাদ্য সংস্থান তারা করতে পারে না। এর পরে দাম্পত্য জীবন প্রায়ই রণক্ষেত্রে পরিণত হয়: স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে, সন্তানরা পিতামাতার বিরুদ্ধে যুযুধান হয়ে ওঠে। শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণের অভাবে দাম্পত্য বিষিয়ে ওঠে। অবশ্য অনেক পরিবার একান্ত নিষ্ক্রিয় নিয়তিবাদে আচ্ছন্ন হয়ে সবটাই অনিবার্য বলে মেনে নিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তান ধারণের প্রসঙ্গে মায়ের মত আছে কি না সেটা দেখাই হয় না। সন্তান আসবার পর অনেক দম্পতির জীবনে আর একটা সংঘর্ষ দেখা দেয়। সেটা হল সন্তানপালন সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা। ছেলেমেয়েকে মানুষ করার অধিকাংশ দায়িত্ব থাকে মায়েরই, অন্তত তারা কৈশোরে পদার্পণ করা পর্যন্ত। কিন্তু শিশুর শৈশব থেকেই তাকে কী ভাবে মানুষ করতে হবে এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলার অধিকার থাকে বাবার। কখনও কখনও ছেলে মেয়ে নিজেদের রুচি নিয়ে তর্ক করে এবং ইচ্ছামতো শিক্ষাক্ষেত্র বেছে নেয়। কিন্তু তাদের জন্য কোন খাতে কতটা খরচ করা হবে, তাদের গৃহশিক্ষক ক'জন থাকবে, আদৌ থাকবে কি না, তারা কোন ধরনের বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য পাবে, ইত্যাদি বিষয়ে মায়ের মত খুব ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পায়। পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নও থাকে–'মায়ের আদরের, বাবার আদরের' থাকার শ্রেণিবিভাগ থেকেও কখনও অশান্তি জন্মায়। কতকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিশ্চয়ই দু'জনে বসে দুজনের পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব। ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তিনির্ভর আলোচনা নিশ্চয়ই দুজনে বসে করা যায় ও ঐকমত্যে পৌঁছনো যায়। দুজনের সন্তানপালন সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা যদি ছেলেমেয়েরা টের পায় তো অশান্তির ক্ষেত্র বাড়ে। মায়ের মতটা অযৌক্তিক হবেই এমন একটা ধারণা নিয়ে এগোলে অবশ্য কোথাও কোনও সমাধান আসে না। যখন মায়ের শিক্ষাগত মান নিচু, তখনও তাকে ধৈর্য ধরে বিষয়টা বোঝালে অনেকটাই বোঝানো যায়। দাম্পত্যে সমানাধিকার স্বীকৃত থাকলে এ বোঝানো অনেক সহজ হয়।

দাম্পত্য জীবনে নারীকে ব্যক্তি হিসেবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে আড়াই হাজার বছর ধরে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলে, উত্তম নারীর সংজ্ঞা হল যে স্বামীকে তুষ্ট করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর উক্তির প্রতিবাদ করে না।(১) আবার বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও এই ধরণের কথা পাই: পুত্রসন্তানই কাম্য, তাই যে স্ত্রী শুধু কন্যার জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পরে পরিত্যাগ করা যায়।(২) নিঃসন্তান স্ত্রীকে দশ বছর পরে এবং মৃত্যুবৎসাকে পনেরো বছর পরে ত্যাগ করা যায়।(২) আপস্তম্ব ধর্মসূত্রও একই কথা বলে।(৪) এবং পরাকতীকালে মনুসংহিতাতেও অনুরূপ উক্তি পাই।(৫) অর্থাৎ বোধটি ভারতীয়দের চিত্তে সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই দৃঢ়প্রোথিত। তবে এই যে 'প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ'।(৬) এই বোধটি শুধু ভারতবর্ষই নয়, সারা পৃথিবীতেই চলিত ছিল। নিঃসন্তান নারীকে স্বামী পরিত্যাগ করতে পারত, নেহাৎ ত্যাগ না। করলেও তাকে অসম্মানে নির্বাসিত করা হত। ইউরোপে কোনও কোনও অঞ্চলে সন্তান ধারণ না করতে পারলে সে নারীকে পরিহার করা হত, অন্তত তাকে খুব নিচু চোখে দেখা হত।(৭)

সন্তানহীনতার জন্য এতাবৎকাল শুধু নারীকে দায়ী করে বহু ক্ষেত্রে দাম্পত্য তিক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যদিও আজ আমরা জানি, বন্ধ্যা নারীর মতো নিষ্প্রজ পুরুষও আছে, এবং দুজনেই সুস্থ ও প্রজননে সমর্থ হলেও বহুক্ষেত্রে সন্তান আসে না। আজকের বিজ্ঞান এর কিছু প্রতিকারও করেছে। কিন্তু এ সব জ্ঞান ছিল না বলে নারী বহু অবিচার ভোগ করেছে, সংসারে অনর্থক দোষারোপ নিরুপায় ভাবে সহ্য করেছে। তার একটা কারণ উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সমাজে নারী সম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার শ্রম থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। এখন তার ওপর বর্তেছে সম্পদের উত্তরাধিকারী ভোক্তা উৎপাদন করার দায়িত্বটি।(৮) যে দাম্পত্যে পুত্রসন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী নিরন্তর আশঙ্কায় ত্রস্ত থাকে–স্বামী তাকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করবে–সে দাম্পত্য তো ততক্ষণ পর্যন্ত নিরন্তর দোলাচল থাকবে। অথচ বিজ্ঞানের

গবেষণা বহু দশক আগেই সমাজকে জানিয়েছে যে, নারীর বন্ধ্যাত্ব যেমন সন্তানহীনতার কারণ হতে পারে, পুরুষের নিষ্প্রজত্বও ঠিক ততটা পরিমাণেই সন্তানহীনতার জন্যে দায়ী হতে পারে। আবার দুজনেই পুরো স্বাভাবিক হলেও শতকরা পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে সন্তান আসে না। ঠিক তেমনই কন্যাসন্তান না পুত্র সন্তানের জন্মের মধ্যে মা-বাবা কারওরই কোনও দায়িত্ব বা কৃতিত্ব নেই। ঘটনাটি সম্পূর্ণ আপতিক। তবু সেটা এখনও মানুষের বোধের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। তাই ধনী শিক্ষিত পরিবারে এমনিওসেন্টেসিস চলছে ও ব্যাপক হারে কন্যাভ্রাণ নষ্ট করা হচ্ছে, তথাকথিত 'চিকিৎসক'-এর সাহায্যে। এখনও আমরা মুখে বলি, ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, কিন্তু পরিবার ও সমাজের চোখে পুত্রের জননী এখনও কন্যার জননীর ঊর্ধ্বের্ব আসীন। গর্ভে পুত্র না। কন্যা আসছে। এ ব্যাপারে নারীর দেহটির পর্যন্ত যথার্থ কোনও দায়িত্ব নেই, তবু এই অসমাদৃষ্টি। এর ফলে বধূটিকে সইতে হয় গর্ভকালে আতঙ্ক ও কন্যা জন্মে অপমান।

দাম্পত্য অশান্তির অনেকটা অংশেই নারী সম্পর্কে সমাজের এই তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাই দায়ী। এমনকী হৃদয়বৃত্তিতেও নারীর নৃত্যুনতা, ক্রুরতা, কামুকতার কথাও শাস্ত্র বলেছে, যাতে সে অবজ্ঞার পাত্রী হয়। প্রাচীন যুগে একটি প্রচলিত ধারণা ছিল নারী প্রেমে উৎসাহিনী নয়, সে শুধু যৌন মিলনেই আকাক্তিক্ষনী। মহাভারতে এ কথা অপ্সরা পঞ্চচুড়াকে দিয়ে বালানো হয়েছে: 'নারী স্বভাবতই অবিশ্বাসিনী, কামনা ছাড়া কোনও কিছুকেই সে মনে স্থান দেয় না এবং কামনায় উত্তেজিত হয়ে সে না করতে পারে এমন কোনও কাজই নেই।(৯) তারও আগে ঋগ্বেদে স্বয়ং উর্বশী তার প্রেমিক পুরুদরবাকে বলছে, 'একটি নারীর জন্য কেন তুমি আত্মহত্যা করবে? কোরো না। নারীর সঙ্গে কোনও বন্ধুত্বই হয় না, এদের হৃদয় নেকড়ে বাঘের মতো।' লক্ষণীয়, এই দুটি ক্ষেত্রেই নারীর বিরুদ্ধে, তার হৃদয়হীনতাকে প্রতিপাদন করবার ভার নিয়েছে নারীই।

এবং মনে রাখতে হবে, এই দুটি অংশেরই রচয়িতা পুরুষ। তবে কেন নারীর বিরুদ্ধে এমন মিথ্যাচার? পুরুষ কি সত্যিই বিশ্বাস করে যে নারী প্রেমে অক্ষম কামনাসর্বস্ব জীবমাত্র? একেবারেই নয়। এই রকম একটি ধারণা–বিশ্বাস নয়— ধারণা ও জনশ্রুতি তৈরি করতে পারলে সমাজে নারীকে ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করা সহজ হয়। তা ছাড়া, কামসর্বস্ব নারীই যে পুরুষের পদস্থলনের হেতু এমন একটি মিথ্যা সমাজে চালু থাকলে পুরুষের অনৈতিক জীবন সম্বন্ধে নৈতিক দায়িত্ব অনেক কম। দুটি উক্তিই বসানো হয়েছে অপ্সরার মুখে, যারা স্বর্গবেশ্যা। কিন্তু দুটিতেই আছে সাধারণীকরণ, অর্থাৎ এ ধরনের হৃদয়হীন কামুকতা যে নারীমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। এই ধরনের ধারণা এ দেশের যৌথমানসে দীর্ঘকাল ধরে অন্তলীন ভাবে বিদ্যমান থাকার ফলে পুরুষের পক্ষে নারীকে অবজ্ঞা করা সহজ হয়েছে। গণমানসে প্রোথিত ধারণা অবচেতনের স্তরে থেকেও দাম্পত্যকে কলুষিত ও বিকৃত করতে পারে এবং করেও। সমান অধিকারের মধ্যে ছিল এর প্রতিকার। ১৭৯২ সালে মেরি উলস্টানক্রাফট লিখেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, পুরুষের একচ্ছত্র অধিকারের দাপট থেকেই নারীর স্বভাবে বহু ভ্রমপ্রমাদ জন্ম নেয়।. স্বাধীনতা পেলে তার চরিত্র অনেক বেশি পরিপূর্ণতা পাবে।'(১১) প্রাচীন শাস্ত্রে, এবং নারীর নিকৃষ্টতার এই বোধ নিয়েই পুরুষ বিয়ে করে। আরও দুঃখের বিষয়, নারী নিজেও এই বোধবিশ্বাসের পরিবেশেই লালিত হয়। বারে বারে শোনা যায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারিত 'মেয়েমানুষ' এবং গর্ব ও দম্ভের সঙ্গে উচ্চারিত 'পুরুষ'। এখন, সবে কিছুকাল ধরে শহরের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের যৎসামান্য কিছু অংশ নিজেদের এই ধারণা থেকে মুক্ত করে নারীপুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে যুগ্মজীবন রচনা করতে উদ্যত হয়েছে।

শুধু আর্থিক স্বাবলম্বিতাতেও এ সুপ্রাচীন বৈষম্যবোধ ঘোচে না। এমনও দেখা যায়, স্ত্রী স্বামীর সমান বা তার চেয়ে বেশি উপার্জন করা সত্ত্বেও গৃহকর্ম ও

সন্তানপালনের দায়িত্ব প্রায় সবটাই নিজের ওপর তুলে নিয়েছে। চাষি-বীে বা মজুরনি। সারাদিন বাইরে খেটে ফিরে স্বতন্ত্র উপার্জন থাকা সত্ত্বেও সংসারের যাবতীয় কর্তব্য একই সমাধা করছে। স্বামী তাকে সাহায্য করতে যাচ্ছে না, স্ত্রী চাইতে সাহস পাচ্ছে না। কাজেই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নারীকে এই বোধ দিতে পারছে না যে, সে সংসারে পুরুষের সমকক্ষ। এর জন্যে চাই চেতনার মুক্তি। সেটা সময়সাপেক্ষ এবং তার জন্যে চাই দীর্ঘ সচেতন প্রস্তুতি ও সংগ্রাম। এর একটা সূত্রপাত হয়েছে, একটি শুভলক্ষণ খুব মৃদু, প্রায় অলক্ষ্যে হলেও ইদানীং দৃষ্টিগোচর হচ্ছে: কিছু কিছু মুক্তমনা পুরুষ স্ত্রীকে গৃহকর্মে সাহায্য করছেন। সংসারের কাজে সাহায্যকারী দুখপ্রাপ্য হয়েছে বেশ কিছুকাল ধরেই, ফলে দম্পতির এই পারস্পরিক সাহায্য অত্যাবশ্যক শুধু নয়, অপরিহার্য। কিন্তু বেশ কিছু দাম্পত্যে এই সাহায্যের অভাবে চিড় ধরেছে। মেয়েটি একলাই সন্তান, সংসার, শ্বশুরবাড়ির পরিজনদের পরিচর্য করবে। এই আশা করে ছেলেটি, বলে ‘ও সব তো মেয়েদের কাজ’–এ মেয়েটি বাইরে চাকরি করলেও এই সংসারসেবা সে একই করবে। এমনটাই আপেক্ষিত। এই কাজের বোঝার গুরুভারে ক্লিষ্ট এবং সংসারের কাজে স্বামীর সহযোগিতা না পাওয়ায় যে অসহায়তা ও প্রচ্ছন্ন অত্যাচারের আভাস থাকে তাতে মেয়েটি স্বভাবতই বিরূপ ও ক্ষুব্ধ হয়। মুশকিল হল এই যে, আমাদের শাস্ত্রে, সাহিত্যে, সমাজে এই পারস্পরিক সাহায্যের কোনও নজির নেই বরং উল্টোটাই আছে। মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলেছিলেন যে, প্রত্যুষে উঠেই সারাদিন তিনি অবিশ্রাম গৃহকর্ম করে চলেন; তাঁর মধ্যরাতের বিশ্রাম পর্যন্ত দায়িত্বের যে ফিরিস্তি তিনি দেন তার সঙ্গে মেলে তাবৎ ধর্মশাস্ত্রে গৃহিণীর দিনচর্যার নির্দেশ। এমন কথাও আছে যে, নারী সর্বদাই গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকলে সে অন্যায় কর্ম থেকে নিরস্ত থাকে। তবে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে ও ইসলামিক শাস্ত্রেও ঠিক একই রকমের ফিরিস্তি। এর মূলে সব প্রাচীন সমাজেই বিশ্বাস ছিল যে, নিরন্তর কাজের মধ্যে না থাকলে নারী দুশ্চরিত্র হয়ে যাবে, তাকে সে সুযোগ না দেওয়া তার চরিত্র-রক্ষারই একটা উপায়। কিন্তু

দাম্পত্যে কাজের ভারের এই অসম বণ্টন নারীকে শরীরে মনে পীড়িত করে এবং এর ফলে যে অশান্তির সৃষ্টি হয় তার কোনও প্রতিকার থাকে না। আরও ক্ষতি হয়: পুত্রকন্যারা বুঝে যায় গৃহকর্ম নারীরই এলাকা, অর্থাৎ ওই অসাম্যের বিষয়টা সঞ্চারিত হয়। পরবর্তী প্রজন্মেও।

শাস্ত্র বলে, দুর্ভাষিণী স্ত্রীকে স্বামী এক বছর পরে গয়না কেড়ে নিয়ে ত্যাগ করবে;(১২) রোগিণীকে তিন মাস পরে, সুরাপায়িনী, অপব্যয়িনী, স্বামীদ্রোহিনী ও বন্ধ্যা স্ত্রীকেও ত্যাগ করবে।(১৩) ওই সব কটা দোষই স্বামীরও থাকতে পারে, সমাজ তার জন্যে কোনও শাস্তিবিধান করেনি। যেটা অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা মনে হয় সেটা হল, রোগিণীকে ত্যাগ করার কথা। নিরুপার্জন রোগিণী শারীরিক ও আর্থিক ভাবে সম্পূর্ণ অসহায়, তাকে আশ্রয়, চিকিৎসা, শুশ্রুষা, ভরণপোষণ ও সান্ত্বনা দেওয়ার দায়িত্ব রইল না তার স্বামীর। পরিত্যক্ত রোগিণীর কী উপায় হবে সে সম্বন্ধে শাস্ত্র নীরব। এটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, বিবাহ ও দাম্পত্য সম্বন্ধে সমাজের যে বোধগত ভিত্তি ছিল তা হল সংসারটা পুরুষের স্বচ্ছন্দ নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার জন্যেই, তার কোনও ব্যত্যয় যদি স্ত্রী ঘটায় তা হলে তার জন্যে দরজা খোলা আছে। দুর্ভাষী, সুরাপায়ী, অপব্যয়ী, স্ত্রীদ্রোহী এবং প্রজননে অক্ষম পুরুষ। শুধু পুরুষ বলেই গার্হস্থ্য দণ্ডবিধির আওতার বাইরে। বস্তুত এই দু'। মুখো বিধানে বহু দাম্পত্যের ভিত্তিটা গোড়া থেকেই নড়বড়ে হয়। কত অসংখ্য পরিবারে মাতাল, দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী, কটুভাষী স্বামী দাপিয়ে প্রতাপ জাহির করে স্ত্রীকে পদানত রাখছে; স্বামীর শারীরিক বৈকল্যে সন্তান না। আসলে স্ত্রীকেই নিষ্ঠুর ভাবে নিন্দা করছে স্বামী ও তার পরিজন। এর একটা কারণ, সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় নারীর অধিকার, ব্যক্তিত্ব তার সামাজিক অধিকার একেবারেই উপেক্ষিত। ফলে তার নিজের ও আশপাশের সকলের ধারণা ও বিশ্বাস জন্মায় যে সে যথার্থই ঊনমানব। দুমুঠো ভাত ও দু'খানা কাপড়ই তার একমাত্র

অধিকার। এই বোধ বিশ্বাসের ফলে তার পুষ্টির কথা পরিবার ভাবে না। এবং সে শুধু প্রাণধারণের মতো খাদ্য ও লজ্জা নিবারণের মতো বস্ত্র পায়। রোগে চিকিৎসা কমই জোটে এবং তার মানসিক বিকাশের জন্য কোনও ভার কেউ নেয় না। এর প্রতিকার হচ্ছে না। দাম্পত্য ভেতরে ভেতরে কবেই ভেঙে গেছে, তার ফাঁপা কাঠামোটাকেই সমাজ দম্পত্য বলে অভিহিত করছে। ওই ধরনের অত্যাচারী স্বামীর দাপট বহু স্ত্রী অসহায় ভাবে সহ্য করছে। আজ কোথাও কোথাও যে এই অন্যায় অত্যাচারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিকার খুঁজছে এবং পাচ্ছে সেটা একটা আশার কথা।

---

১. ঐ. ব্রা. (৩.২৪.২৭)

২. বৌ. ধ. সূ. (১.১০.৫১-৫৩)

৩. বৌ. ধ. সূ. (২.৪.৬)

৪. আ. ধ. সূ. (২.৫.১১-১৪)

৫. মনু (৯.৪)

৬. মনু (৯:২৬); অনুরূপ বাক্য ‘ক্ষেত্রভূত স্মৃত নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান।’ পূর্বোক্ত (৯:৩৩)

৭. ‘in some regions she was case off by her husband or was at any rate held in little esteem if she was unable to have children. The European Fantly p 124

৮. ‘Whereas the farmer’s and the master’s wife played a decisive part in the production of goods for sale and for every day consumption in the domestic economy, the middle class woman was the first to be restricted to the task of private production.’ পূর্বোক্ত, p. 130

৯. মহা. (১৩.৩৮.১১-৩০)

১০. ন বৈ ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবুকানাং হৃদয়ান্যেতা। ঋগ্বেদ (১০:৯৫:১৫)

১১. A indication of the Rights of Women pp. 214-215

১২. মনু (৯/৭৮)

১৩. যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (১.৭৩)

প্রেম

দেখা যাচ্ছে যে, বিবাহ ব্যাপারটাই নানা কারণে বড় গোলমেলে। পণ্ডিতরা বলেন, মানুষের সমাজ দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে ঐক্যবিবাহে পৌঁছেছে এবং এ ব্যাপারটা যখন বহু সহস্রাব্দ ধরে সুস্থায়ী হয়েছে তখন এইটিই নরনারী সম্পর্কে বিবর্তনের চূড়ান্ত ও অক্ষয় পর্যায়–এক হিসেবে ঐতিহাসিক ভাবে চূড়ান্ত। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে এটা মোটেই অক্ষয় নয়। প্রথমত, বহু আদিবাসী জীবনে ঐক্যবিবাহ প্রচলিত নয়; তাদের নারী পুরুষ উভয়ই বহুগামী, সন্তানও পিতৃপরিচয়ে পরিচিত নয়। এদের সংখ্যা কম নয়, এবং

যেহেতু আমাদের সঙ্গে মেলে না সে হেতু এদের নারীপুরুষ সম্পর্ক বৈধ নয় এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই। দীর্ঘকাল ধরেই বহুগামিত্ব–নারী পুরুষ উভয়েরই–সমাজে আচরিত এবং স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, প্রায় অর্ধশতাব্দীরও আগে থেকে ক্যাথলিক জগতে, ইয়োরোপে, উত্তর ও প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকাতেই এবং অন্যান্য ক্যাথলিক অধুষিত অঞ্চলে যখন বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, তখন সরকারি ভাবে অর্থাৎ ধর্মের সংস্থায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে নারী পুরুষ পরস্পরের কাছ থেকে এমনিই সরে যাচ্ছে। তারা অন্য সঙ্গী ও সঙ্গিনীর সঙ্গে একত্র বাস করছে। একটা কারণ, বিবাহবিচ্ছেদের পরে দ্বিতীয় বিবাহ ক্যাথলিক ধর্মে অনুমোদিত নয়। তৃতীয়ত, প্রায় ওই সময় থেকেই বেশ কিছু নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই একত্র বাস করছে। কারণ, ক্যাথলিকরা বলেন, বিয়ে করলে সে বিয়ে যদি না টেকে তো ক্যাথলিক মতে বিচ্ছেদ হলে পর যখন পুনর্বার বিবাহ করা বে-আইনি তখন ওই জটিলতার মধ্যে না ঢুকে ওর মূলোচ্ছেদ করাই ভাল। যে যাকে চায় তার সঙ্গে বাস করুক। যদি বিয়ের পর কোনও দিন তার মধ্যে সাচ্ছন্দ্য বা আনন্দ আর না থাকে তো সরে গেলেই হল। সরে গিয়ে কেউবা একলা থাকে, কেউ ক্রমান্বয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনী পরিবর্তন করে। অনেকেই মনের মতো সঙ্গী বা সঙ্গিনী পায় এবং খুব সুখী হয়। কেউবা বারবার সঙ্গী সঙ্গিনী পরিবর্তন করে চলে, মনের মতো সুখ পায় না, কিংবা কোথাও স্বল্পকালের জন্য সুখ পায় পরে আবার সেটা ফুরিয়ে যায়।

এখনও সমাজে অধিকাংশ মায়ের ক্ষেত্রে বিয়ের ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য কম। অথচ এখনও এ দেশে অধিকাংশ মেয়ের জীবনের পরিণতি দাম্পত্যে। তার বিবাহোত্তর জীবনের সুখ দুঃখ সাচ্ছন্দ্য-অসাচ্ছন্দ্য সবই নির্ভর করে প্রভু অর্থাৎ স্বামীর ওপরে। সে কারণেই স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে তার এমন স্বাধীনতা থাকা উচিত যে, যতক্ষণ না মনোমত স্বামী পায় ততক্ষণ যেন পরিবর্তন করতে পারে। জনসটুয়ার্ট মিল, প্রায় দেড়শো বছর আগে, ১৮৬৯

সালে বলেছিলেন, 'যেহেতু তার জীবনের সব কিছুই নির্ভর করছে একটি ভাল প্রভু লাভ করার ওপরে, সেই কারণে তাকে বারবার পরিবর্তন করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না সে তেমন একজনকে পায়। ... দাসত্ব সম্বন্ধে স্বাধীনতাই একমাত্র উপশম, যদিও তা-ও পর্যাপ্ত নয়। এ অধিকার প্রত্যাখ্যাত হলে স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে ক্রীতদাসীতে পরিণত হয়ে যায়।'(১) দাম্পত্যে সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা নারীর পক্ষে বেশি প্রয়োজন, কেননা সমাজ তাকে নানা ভাবেই পুরুষের অধীন করে রেখেছে; অতএব পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে প্রভুর কাছ থেকে জীবনে তার নিষ্কৃতি নেই সে তার মনোমত হওয়া অনেক বেশি জরুরি ও বাঞ্ছনীয়। বিশেষত, সমাজ যখন এ স্বাধীনতা পুরুষকে দিয়েছে। কিছুকাল আগেও পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারত এবং এখনও গণিকালয়ের দ্বার তার কাছে খোলা; পরাস্ত্রীর সান্নিধ্যও সে সদর রাস্তায় না। পেলেও খিড়কি দরজা দিয়ে পায়। অবশ্যই কিছু বিবাহিত নারীও কখনও কখনও পরী-পুরুষের সঙ্গ পায়; কিন্তু একে তো দেশের অধিকাংশ নারীর পক্ষে সে পথে দুস্তর বাধা, তার ওপরে তার কলঙ্কের বোঝাও অনেক অনেক গুরুভার। একটি পরস্ত্রীকামুক পুরুষের চেয়ে এই নারীদের অবস্থা কবির ভাষায়:

বাঁশি বাজে বনে বসন্ত রাগে,
জটিলা, কুটিলা দুয়ারে জাগে ॥(২)

বিবাহের উদ্যোগপর্ব থেকে নারীকে নিস্ক্রিয় ভূমিকায় রাখা হয়, বিবাহের পরেও পুরুষতন্ত্রে সে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তার স্বার্থ, তার চিন্তা, সিদ্ধান্ত, আবেগ, অনুরাগ-বিরাগ, এমনকী তার স্বাস্থ্যও পরিবারে গুরুত্ব পায় না। সন্তানপালনে তার ভূমিকা স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু সে ব্যাপারে তার মতামত উপেক্ষণীয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে রচিত একটি ইংরেজি কাব্যাংশ এখানে প্রযোজ্য:

তারা উত্তর করতে পারে না
তারা প্রশ্ন করতে পারে না
তারা শুধু করে আর মারে। (৩)

এ বৈষম্য বিবাহিত জীবনের পদে পদে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, এমনকী শিক্ষিত নারীর ক্ষেত্রেও; এবং এ ব্যাপারটা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে নারী বা পুরুষ কেউ-ই এর গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নয়। সোলোমন দেখিয়েছেন, নারী নিজের অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারত না, স্বামীই ছিল পরিবারের প্রভু, সন্তানরা ও ক্রীতদাসরা ছিল নিম্নবর্গের জীব। শুধুমাত্র পিতার অবর্তমানে মায়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। স্ত্রী ছিল স্বামীর অধীনে। (৪)

বিবাহিত জীবনে পরিবারের বৃহত্তর সমাজের এবং স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যেকার বাধা মাঝে মাঝেই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিবাহ দুজনের কাছেই, কখনও বা একজনেরই কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়। কেন যে এটা হয় তার বাইরের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃষ্টিগোচর, যেমন আর্থিক অসঙ্গতি, রুচির বৈষম্য, সন্তানপালন সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য, জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে মতবৈষম্য, পারিবারিক সমালোচনা, স্বামীর নিজের পরিবারের আচরণ ব্যাপারে পক্ষপাতী অন্ধতা, স্ত্রীর আপনি পরিবারের প্রতি আনুগত্য বা কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে স্বামীর ও শ্বশুরবাড়ির অসহিষ্ণুতা— এই সব, এবং আরও হাজারটা কারণ দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে। যথাকলে অর্থাৎ সূচনাতেই পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে এর নিষ্পত্তি না ঘটলে অভিযোগ ক্রমে অনুক্ত থেকে উক্ত এবং মৃদু থেকে দুর্বিষহ কটুতায় পরিণত হয়। তখন পরস্পরকে সহ্য করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে, বিয়ের ভিত টলে যায় এবং বিচ্ছেদ যেন অনিবার্য বলে মনে হয়। সূচনায় আলোচনায় মতৈক্য থাকলেও পরে বারে বারেই সে ঐক্য ভেঙে যায়, কারণ মানুষের চিত্ত ও জীবনবোধ সচল অন্তত পরিবর্তনশীল; কাজেই বারে

বারেই এ ধরনের আলোচনার প্রয়োজন। এবং এ আলোচনা নিয়ন্ত্রিত হয় ঐকমত্যে পৌঁছবার শুভবুদ্ধি দিয়ে।

এ তো গেল বাইরের কারণ। এ ছাড়াও দুটি মানুষের ভিতরে, যদি প্রেম একদিন থেকেও থাকে। তবু, আপাত ভাবে সম্পূর্ণ অকারণেও একদিন তা নিশ্চিহ্ন হয়। মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, কারণটা অবিদ্যমান নয়, তবে দুলক্ষ্য। তবে ফলটা খুবই স্পষ্ট: প্রেমের মৃত্যু। বোধহয় পুর্বরাগের পরের বিবাহে প্রেমের মৃত্যুর সবটা আর্তি ধরা পড়েছে প্রাচীন ভারতের নারী কবি শীলা ভট্টারিকার একটি বিখ্যাত কবিতায়:

‘যে আমার কৌমার্য হরণ করেছিল, (পরে) সেই হল বর। সেই রকমই ফুল্ল মালতীর গন্ধ বয়ে আনছে কদম কুসুমের গন্ধবাহী বাতাস। আমিও সেই আমিই আছি, তথাপি (আজ) সেই (সংকেত) স্থলেই মিলনের লীলাবিধিতে এই রেবা নদীর কূলে বেতসকুঞ্জে চিত্ত (কেন যেন) উৎকন্ঠিত হয়ে উঠেছে।’(৫)

কেন–তা নায়িকাও জানে না। যে-প্রেমের আকুতিতে একদিন কুমারী শরীর প্রেমিককে স্বেচ্ছায় অর্পণ করেছিল সে পরে তাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। সেই পুরনো অভিসারের যে কুঞ্জ রেবানদীর তটে, তেমনই কদম আর মালতীর গন্ধে উদ্দাম সমীরণ, অথচ আজকে মিলনলগ্নে চিত্ত কেন এমন নিরুৎসুক? এমন উদাসীন? কেন, তা কে জানে? প্রেমের অপর এক কবি আমরু-র শতক কাব্যে।’ এমনই আর একটি দুর্লভ রত্ন আছে:

‘যেখানে ভ্রূকুটিরচনাই ছিল ক্রোধের প্রকাশ, চুপ করে থাকা ছিল অত্যাচার, পরস্পরের (দিকে চেয়ে) স্মিতহাসি ছিল অনুনয়, দৃষ্টিপাত ছিল প্রসন্নতা— দেখ, সেই প্রেমের আজ এ কী মৃত্যু: তুমি আমার পায়ে লুণ্ঠিত, তবু এই হতভাগিনীর ক্রোধ যায় না।’(৬)

বেশি না হলেও আরও কিছু দৃষ্টান্ত আছে কাব্যে সাহিত্যে। কবি বলছেন: 'যে প্রেম একদা সজীব ও উদ্বেল ছিল সেই প্রেমে নেমে এসেছে বিমুখ ঔদাসীন্য।' বিদেশি সাহিত্যে প্রেমের মৃত্যুর এই ধরনের বিবরণের অনেক বেশি দৃষ্টান্ত মেলে।

বহু স্থলে তৃতীয় বা তৃতীয়ার সমাগমে পূর্বপ্রেমে ক্লান্তি অনুভূত হয়। নতুনের সম্বন্ধে কৌতুহল, আগ্রহ অধীরতায় পৌঁছয়, দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী গৌণ নিষ্প্রভ হয়ে যায়! আবার কখনও বা অন্য কারও উপস্থিতির আগেই প্রেমে শৈথিল্য দেখা দেয়। ক্লান্ত, পুরনো, একঘেয়ে লাগে পূর্ব-প্রণয়ের সমস্ত অনুষঙ্গকে। তার পরে কখনও নতুন অনুরাগ জন্মায়। কখনও বা জন্মায়ও না, শুধু পুরাতন প্রেম সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের মধ্যে দিয়ে নেমে আসে একজীবনের প্রেমের মৃত্যুর সূচনা। যে-পক্ষ এটা অনুভব করে সে কখনও কখনও চিত্তের এই পরিণতিতে ব্যথিত হয়। কালিদাসের বিক্রমোেবশীয় নাটকে নতুন প্রেমে উজ্জ্বল পুরস্কারবাও অল্পক্ষণের জন্যে হলেও সত্যই ক্লেশ ভোগ করেছিলেন অনুরাগিণী বধু ঔশীনারী সম্বন্ধে তার ঔদাস্যে। কিন্তু তখন তাঁর জীবনে সে প্রেমের মৃত্যু ঘটে গেছে, পুরস্কারবার চিত্তবৈকল্য সেই মৃত্যুর জন্যে শুধু ক্ষণিক শোক। জীবন জটিল, প্রেমের জীবনও বহু দুঃসমধেয় জটিলতায় আকীর্ণ।

ফলে বিয়ে ভাঙে। কখনও ধীরে ধীরে, কখনও সহসা। তখন দেখা দেয় নতুন কিছু সমস্যা। কিন্তু তার আগে এই ভাঙা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও সমাজ কী বলেছে একটু দেখা যাক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-তে 'ধর্মস্থীয়' প্রকরণে বলা আছে, বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক পতিকে যদি স্ত্রী ত্যাগ করে তবে তাকে স্বামী কিছুই দেবে না। বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে ত্যাগ করলে তাকে তার যা প্রাপ্য তা দিতে হবে। যদি দু'জনে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ পোষণ করে তাহলে সে বিবাহ থেকে দুজনেই মুক্ত হতে পার। (৭)

তা হলে কৌটিল্য স্বীকার করেছেন যে, যেখানে বিবাহের মানসিক ভিত্তি ভেঙে গেছে, অনুরাগের স্থানে এসেছে বিরাগ, সেখানে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করতে পারে। যদিও আগের অংশে আছে বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে পুরুষ ত্যাগ করলে কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব তার থাকে, কিন্তু বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক পুরুষকে স্ত্রী যদি ত্যাগ করে তা হলে সেই স্ত্রীকে খালি হাতেই চলে যেতে হবে। স্পষ্টই এখানে দুমুখো মানদণ্ড; নারীর বিপক্ষে আইন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, বিচ্ছেদ অনিচ্ছুক স্বামীকে স্ত্রী ইচ্ছে করলে ত্যাগ করতে পারে। এবং দু'জনেই যদি পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয় তা হলে বিচ্ছেদ শাস্ত্র সমর্থিত। কৌটিল্যের সময়ে আইন যেটুকু ন্যায়-নির্ভর ছিল তা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। মনুসংহিতা প্রায় পাঁচশো বছর পরের রচনা। মনুতে নারী তার বহুবিধ অধিকার একে একে হারিয়েছে। মানবাধিকারের দৃষ্টিতে ঊনমানব (মনুতে শুধু সতীদাহই নেই, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর জীবন্মুত হয়ে বেঁচে থাকার নির্দেশ আছে)। মনুতে দেখি উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব নিবীর্য, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পতির পরিচর্যায় অনিচ্ছুক স্ত্রীকেও ত্যাগ করা চলবে না; ভরণপোষণের দায় প্রত্যাহার করাও চলবে না। কিন্তু 'স্ত্রী যদি পাগল, সুরামত্ত, রোগাক্রান্ত পতিকে ত্যাগ করে তা হলে তিন মাস অপেক্ষা করে তার বসনভূষণ কেড়ে নিয়ে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত।' যদি সচ্চরিত্রা বধু প্রতিকুল অথবা সুরাসক্ত, অত্যাচারী ও অর্থলোভী হয় তবে সে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য বিবাহ করা বিধেয়। এই দ্বিতীয় বিবাহে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রথমা পত্নী যদি বাসগৃহ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়, তবে তাকে হয় আটকাতে হবে (টীকায় আছে, দড়ি দিয়ে বেঁধে আটকানোর কথা) নয়তো সমস্ত বৃহৎ পরিবারের সামনে প্রকাশ্যে তাকে ত্যাগ করতে হবে।(৮) সবিস্ময়ে স্মরণ করি ঋগ্বেদে ঊষার একটি বিশেষণ 'পুনর্যতী'। সায়ণের ভাষায়, 'স্বামীকে ত্যাগ করে যে ব্যভিচারিণী হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়।'(৯) দেখা যাচ্ছে, স্বামীকে ত্যাগ করার কল্পনা ওই সমাজে

অপরিচিত ছিল না। পরে নারীর এই স্বাধীনতা হারিয়ে গেল, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে অব্যাহতই রইল।

এখানেও ওই দু'মুখো নীতি খুবই স্পষ্ট। যদিও মনুর প্রথম শ্লোকে জুগুপ্সিত অবস্থার স্বামীর পরিচর্যায় অনিচ্ছুক স্ত্রীকে ত্যাগ করবার অধিকার দেওয়া হয়নি। কিন্তু এটা বিস্ময়কর এক উদারতার প্রমাণ, কারণ পরবর্তী পুরাণ সাহিত্যে বারংবার উপদেশ ও উপাখ্যানে ওই রকম স্বামীর সর্বতো ভাবে সেবা করবার নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। এবং, দ্বিতীয় শ্লোকে ওই

উদারতা প্রত্যাহৃত হয়েছে। পরাশর ধর্মশাস্ত্রে যে সব পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে তারই কিছু ক্ষেত্রে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করবার নির্দেশ এখানে আছে। আবার সতী সাধবী নারী সুরায় আসক্ত এবং স্বামীর প্রতি বিদ্বিষ্ট হলে তাকে ত্যাগ করে পুনর্বার বিবাহ করার অধিকার স্বামীকে দেওয়া হল। এ ভাবে লঙ্ঘিতা এবং লাঞ্ছিতা স্ত্রী গৃহত্যাগে উদ্যত হলে তাকে (দড়ি দিয়ে বেঁধে) আটকাতে হবে, নয়তো প্রকাশ্যে পরিজনসমক্ষে তাকে ত্যাগ করতে হবে। মনুর ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীর মন বলে কিছু থাকতে পারে না, বিদ্বেষ থাকলেও মুক্তি অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদে অধিকার নেই, যে অধিকার কৌটিল্যে ছিল। সমাজ ক্রমে ক্রমে বিবাহকে নারীর পক্ষে কারাগার করে তুলেছে।

বর্তমান আইন কৌটিল্যের মত বিবাহবিচ্ছেদের অবকাশ রেখেছে। কার্যত দুঃসাধ্য হলেও এখন অন্তত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত নারী আইনত স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে। সে নিজে উপার্জন না করলে তার ভরণপোষণের দায়ও থাকে স্বামীর–অন্তত আইনে; যদিও বাস্তবে এটা আদায় করা বহু ক্ষেত্রে খুবই অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। যেটা লক্ষণীয়, তা হল বিবাহ অশান্তির বা কষ্টের হলে তার থেকে আজ নারী পুরুষের মুক্তির উপায় আছে। এখানে যে প্রশ্ন

স্বভাবতই ওঠে তা হল, বিচ্ছিন্ন দম্পতির সন্তানদের কী হবে? আইনে কিছুকাল তারা মায়ের কাছেই লালিত হবে, পরে বাবা চাইলে এবং মা না চাইলে বাবার কাছে থাকবে অথবা মা চাইলে মায়ের কাছে থাকবে। দুজনের কেউই না চাইলে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস করবে, ছুটিতে পালা করে মা, বাবার কাছে এসে থাকবে–যদি তারা চায়। প্রকৃতপক্ষে মা বাবা ছাড়া অন্য সহৃদয় আত্মীয়রাও কখনও কখনও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সন্তানদের দায়িত্ব নেন। নিঃসন্তান দম্পতির ক্ষেত্রে প্রশ্নটি ওঠেই না। এ কথা ঠিকই যে, মা-বাবার মেহের ও যত্নের পরিবেশে লালিত হওয়ার কোনও বিকল্প নেই, যে সন্তান তা পায় তার বাল্য কৈশোরের স্বাদ-গন্ধই আলাদা। কিন্তু প্রশ্নটা উঠেছে, যেখানে দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত ভেঙে গেছে সেখানে সন্তানকে বাবা-মার ভাঙা দাম্পত্যের দরুন যে মানসিক এবং বাস্তবিক নিরাশ্রয়তা, অসহায়তা, কখনও বা অহেতুক নিগ্রহ এবং তার বন্ধুসমাজের পরিবেশ সন্তানকে যে নিদারুণ মর্মপীড়া ভোগ করতে হয় তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে ওই বিশেষ শিশুটির জীবনে অন্য সুখী, পরিপূর্ণশৈশব কৈশোরের সম্ভাবনা তো ভেঙে গেছে তার জনকজননীর দাম্পত্য ভাঙার সঙ্গে। এখন ওই ভাঙা দাম্পত্যে পূর্ণ সুখী পরিবারের ঠাট বজায় রেখে সন্তানকে সেই পরিবেশে লালন করলেও কিন্তু তার যা পাওয়ার ছিল তা সে পায় না। তবু অনেক ভাঙা পরিবারে এই ঠাট বজায় রাখার সিদ্ধান্ত দম্পতি নেন। যদি বাইরে তার গরমিলের কোনও বীজ প্রকাশ না পায় তবে, সন্তান মোটামুটি এক ধরনের সুস্থ জীবনই পায়, যদিও তার কৈশোরের স্পর্শকাতর চিত্ত ঠিকই বোঝে যে, আকাশে মেঘ আছে, বাতাসে বিষ। কখনও কখনও, বহির্মুখী চিত্তবৃত্তি থাকলে এতে তার স্থায়ী ক্ষতি হয় না। আবার অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তি থাকলেও কখনও কখনও শিশু স্বতন্ত্র একটি কল্পলোক তৈরি করে, পিতামাতার সাহচর্য-নিরপেক্ষ সেই জগতেই মনে মনে বাস করে। এমন বেশ কিছু মানুষ দেখা যায় যারা ভাঙা সংসারে লালিত। সব জেনে, সব বুঝে বেশ

কিছু যন্ত্রণা কষ্ট আত্মস্থ করে এরা মানুষ হয়েছে এবং ওই আত্মিক প্রয়াসে তাদের চরিত্রে এক ভিন্ন ও মূল্যবান মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে। আবার এমনও দেখা যায়, মা-বাবার আসন্ন বিচ্ছেদে উন্মাদের মতো বিক্ষিপ্ত হল। যে শিশু বা কিশোর কিশোরী, ধীরে ধীরে তারা তাদের নতুন সামাজিক অবস্থানে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে।

মা বাবা যদি স্বভাবে দীন, আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর না হন, তা হলে ওই ঠাট বজায় রাখা সংসারেও শিশুর এক ধরনের নিরাপত্তাবোধ থাকে। যেটা হয়তো বাড়ি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বোর্ডিং হস্টেলে গেলে থাকে না। তা ছাড়া তাকে সামাজিক পরিবেশিক সমালোচনার সম্মুখীনও হয়তে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুর মানসিক স্বস্তি তার বেড়ে ওঠার পক্ষে অনুকুল ভেবে মা-বাবারা নিজের মতদ্বৈধতা বা বিদ্বেষ চেপে রেখে শিশুর সামনে নির্লিপ্ততার অভিনয় করে চলেন; ফলে শিশু মানসিক ভাবে একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ লাভ করে। কিন্তু, দম্পতির অন্তলোকে ধূমায়িত বিদ্বেষ যদি পরিবারিক পরিমণ্ডলে উদগীর্ণ হয় তা হলে ওই ছলনা। আর থাকে না।

বহু পরিবারে এই ধরনের পরিবারিক আবহাওয়ায় শিশুদের মর্মান্তিক যন্ত্রণা পেতে দেখা যায়, বেশ কিছু শিশু বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং তার চেয়েও বেশি সংখ্যক শিশু কলহ দ্বন্দ্বের ওই বিষাক্ত পরিবেশে বিকৃত মানসিক গঠন নিয়ে বেড়ে ওঠে। মনশ্চিকিৎসকেরা এ ধরনের মনোবিকারগ্রস্থ শিশুর যে পরিসংখ্যান ও বিবরণ দেন তা ভয়াবহ। তা হলে এর প্রতিকার কী? মা বাবা অন্তবিদ্বেষ চেপে গিয়ে সারা জীবন সুখী দম্পতির অভিনয় করে যাবেন? সেটা কি সম্ভব? বাঞ্ছনীয়? সন্তান কি কৈশোরে পৌঁছেও অভিনয়কে অভিনয় বলে চিনতে পারবে না? তার অন্য বন্ধুদের বাড়ির পারিবারিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেও বুঝতে পারবে না যে কোথায় একটা বেসুর বাজছে? একটা বিকল্প হচ্ছে, শিশুটি যাতে বেড়ে ওঠার পথে মোটামুটি অনুকুল একটা

পরিবেশ পায় তার ব্যবস্থা করে দু'জনের বিচ্ছিন্ন হওয়া। এখানে অন্য একটি প্রশ্নও থাকে: ওই দুটি নরনারী প্রথম বিবাহে সুখ পায়নি, যে কোনও কারণেই হোক বিয়েটা ভেতর থেকে যখন ভেঙে গেছে তখন কৃত্রিম অভিনয়ে সেটাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে সরাসরি প্রকাশ্যে ভেঙে দেওয়া এবং দুজনে সম্ভব হলে অন্য সঙ্গী বেছে নিয়ে দ্বিতীয়বার সুখ পাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। এখনও সমাজ একে ওই দুটি মানুষের স্বার্থপরতার প্রমাণ হিসেবেই দেখে। সে দেখাটা ভুল। যখন বিধবাবিবাহ আন্দোলন হয়, তখন তার মূল মানবিক প্রেরণা উৎস কী ছিল? একটি নিরপরাধ নারীর জীবন যাতে পুনর্বার সুখের সন্ধান পায় তা-ই তো? সে নারীর বয়স চোদ্দ না চব্বিশ না চল্লিশ তা তো আলোচ্য ছিল না। সে সন্তানবতী না নিঃসন্তান তা-ও তা ভাবা হয়নি? তার জীবনটা যেন অকালে শুকিয়ে না যায়, সে যেন দাম্পত্যসুখের সন্ধান পায় এই ছিল সে আন্দোলনের মূল প্রেরণা। অপরপক্ষে, কোনও বিপত্নীকের দ্বিতীয়বার বিবাহ করা নিয়ে সমাজ কখনওই কোনও মন্তব্য করেনি; বরং এ কথা বলেছে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরদিনই তার কথা প্রশস্ত এবং বিধেয়। লোকে পোষা কুকুর বেড়ালের মৃত্যুতেও কয়েকদিন মুষড়ে থাকে, এ সমাজে স্ত্রীর স্থান গৃহপালিত জন্তুরও নীচে! কাজেই একবার নির্বাচনে ভুল হলে পুনর্বার নির্বাচন করার অধিকার থাকাই উচিত। প্রথমত এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমবার সঙ্গীকে নির্বাচন করে দেয় পরিবার, সেখানে পাত্র পাত্রীর, বিশেষত কন্যার মত প্রায় উপেক্ষিত। ফলে অন্তত মেয়েদের জন্যে ওই দ্বিতীয়বার সুখের সন্ধান করার পথটা খোলা রাখা বিশেষ প্রয়োজন। মেয়েদের জন্যে বিশেষ করে বলছি। এই কারণে যে, পুরুষের পক্ষে সে পথ বরাবরই খোলা থাকছে। বিধিমতে বিবাহিত স্ত্রী সীতাকে রামচন্দ্র বলেছিলেন, 'তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই, তুমি যাও'। এখনও বাড়িবাড়ি বহু মেয়ে বাসন মাজতে আসে, কারণ, 'স্বামী নেয় না'। স্বামী না নেওয়ার অধিকারটি পেয়েছে আমাদের 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' রামের কাছেই। কারণ, বলাই আছে, রামের মতো

আচরণ করবে, রাবণের মতো নয় (রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ)। এবং অন্তত এ ব্যাপারে অসংখ্য পুরুষ রামের মতোই আচরণ করে। এই পরিত্যক্ত স্ত্রীর দ্বিতীয়বার নতুন জীবনে সুখী হওয়ার মৌলিক অধিকার আছে। বিশেষত, পুরুষ যেখানে হামেশা এক বউ ছেড়ে আবার বিয়ে কিংবা বিয়ে না করেই সংসার পাতে।

প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, বিয়ে ভেঙে যদি দ্বিতীয় সংসারেও সুখ না আসে তা হলে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এই ভাবেই কি চলবে? এর উত্তরে বলা যায় আইন যখন বিচ্ছেদের পরে পুনর্বার বিয়ের অধিকার দিয়েছে এবং ক'বার বিয়ে করা চলবে তার কোনও সংখ্যা নির্দেশ করেনি, তখনই তো বারে বারে সুখের সন্ধান করার অধিকার কায়েম হয়েছে। মুশকিল হল, এমন বহু নজির আছে যেখানে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থবারে সঙ্গী নির্বাচনটি পাকাপাকি সুখের সন্ধান দিয়েছে এবং তার পরের যুগ্মজীবন তিরিশ চল্লিশ বছর অব্যাহত সুখে কেটেছে। এই নির্বাচনের মূল অধিকারটি সংখ্যাসীমা দিয়ে বঁধতে গেলে এটা সম্ভব হত না। কেউ কেউ বলেন, আরও অনেক নজির আছে যারা বারে বারে পরীক্ষানিরীক্ষা করেও কোথাও স্থিতিলাভ করেনি। তেমন অনেক নারী বহু পরীক্ষানিরীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে শেষ জীবনে কখনও বিষন্ন, কখনও প্রসন্ন মনে একক জীবনকেই মেনে নিয়েছে। এদের সমাজের বিরুদ্ধে কোনও নালিশ নেই, কারণ নিজের জীবন নিজের মতো পরিচালনা করার স্বাধীনতা এরা সমাজের কাছে পেয়েছিল। সে পরিচালনায় সুখ হয়তো আসেনি, কিন্তু ওই স্বাধীনতাটা ছিল তার মৌলিক অধিকার। এমন কথাও প্রায়ই শোনা যায় যে, শুধুমাত্র নতুনের সন্ধানে ইতস্তত পরিক্রমই ছিল এই ভাবে বহুবার নতুন জীবন শুরু করার মূল প্রেরণা। হতেই পারে। প্রশ্ন হল, এতে কার কী ক্ষতি হল? ব্যক্তি স্বাধীনতার আমরা তখনই সীমা নির্দেশ করতে পারি যখন তা অন্য কারও পক্ষে ক্ষতিকর। এখানে ওই নিত্যনতুনের সন্ধানে সুখ, দুঃখ, উন্মাদনা, বিষাদ

যা-ই আসুক তা তো অন্য কাউকে স্পর্শ করছে না। যার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে সে-ও জানে স্থায়িত্বের কোনও প্রতিশ্রুতি সে মিলনে নেই। প্রশ্ন হল, এক বিবাহ বন্ধনেই কি সে প্রতিশ্রুতি ছিল? তা হলে তো ভাঙতই না।

আনুষ্ঠানিক বিবাহ নিয়ে একটা মূল প্রশ্ন থেকে যায়, এর আইনগত ও অনুষ্ঠানগত সমর্থন আজকের সমাজে কতটুকু অবশিষ্ট আছে? অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আগেই দেখেছি তা সম্পূর্ণতই পুরুষের অনুকুলে। নারী সে অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। প্রাচীনকালে এর হয়তো কারণ একটা ছিল: নারীর উপনয়ন হত না, বেদপাঠে অধিকার ছিল না, ফলে বিবাহের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে তার অধিকার স্বীকৃত ছিল না। তা ছাড়াও মধ্যযুগ থেকে বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হওয়ায় কী নারী কী পুরুষ আর সরাসরি মন্ত্রোচ্চারণ করত না, করত দু'পক্ষের পুরোহিত এবং তারাই বর ও বধূকে দিয়ে আপেক্ষিত অনুষ্ঠানগুলি করিয়ে নিতে। যাই হোক, অনুষ্ঠান ক্রমেই একটা নির্জীব বহিরাঙ্গে পর্যবসিত হয়েছে। তাতে, বা আইনের রেজিস্ট্রেশনে, যা প্রতিপন্ন হয় তা হল দুটি নারী পুরুষ পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলে স্বীকার করছে এবং সুখে দুঃখে একত্রবাসের প্রতিজ্ঞা করছে। নিহিতার্থ হল, আইনের অনুমোদন না পেলে এ বন্ধন ভাঙা যাবে না। অর্থাৎ এর মধ্যে একটা বাধ্যবাধকতা এসে পড়ল। যতক্ষণ দুজনের মধ্যেকার আকাশটা আবিল না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় দুজনের সঙ্গকামনা করে এবং তা পেয়ে সুখী হয়। এটা প্রাগ-বিবাহ প্রেম থাকলে তো হয়ই, বিবাহোত্তর কালে যেখানে দম্পতির মধ্যে প্রেম জন্মেছে সে ক্ষেত্রেও হয়। এ ছাড়াও যেখানে প্রেম নেই, কিন্তু পারিবারিক শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা, নির্ভরশীলতা, সাহচর্য আছে এবং দু'পক্ষের কারওরই এর বাইরে কোনও প্রত্যাশা নেই, তারা কামনার তৃপ্তি এবং সুখে শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেই পরিতৃপ্ত হন, এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এই তিনটি ক্ষেত্রেই বন্ধনটি পীড়াদায়ক নয়, বরং পরিতৃপ্ত যুগ্মজীবনের একটা সীমানির্ধারক মাত্র। এ সীমাকে অতিক্রম করলে দম্পতির একজন অন্যের

প্রতি বিশ্বাসঘাতক হয় এবং ওই আনুষ্ঠানিক বা আইনের কাছে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী হয়।

সমস্যা শুরু হয়। এইখানেই। যখন ওই বন্ধন আর ভেতরে সত্য থাকে না তখনই তা উদ্বন্ধনে পরিণত হয়, সংসার হয়ে ওঠে কারাগার এবং জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে নরক। কখনও কখনও দুজনেই, এবং কখনও বা দুজনের একজন তখন পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

_____

১. 'Since her all in life depends upon obtaining a good master, she should be allowed to change again and again until she finds one the free choice of servitude is the only, thorugh a most insufficient alleviation its refusal completes the assimilation of the wife to the slave.' The Subjection of Women, p 249

২. প্রমথ চৌধুরী: সনেট পঞ্চাশিকা

৩. 'Theirs not to make reply,

Theirs not to reason why,

Theirs but to do and die.' (Alfred Tennyson: The Charge of the Light Brigade)

8. 'A woman did not question her place, the husband was the family's head, children and bonded servants were in lower categories, the mother had full authority only in the

father’s absence The wife was subordinate of her husband In the Company of Educated women p 2

৫. যঃ কৌমারহরঃ সি এবং হি বরস্তশৈচব চৈত্রক্ষপা

স্তেচোমীলিতমালতীসুরভিয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কাদম্বানিলাঃ।।

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ

রেবারোধিসি বেতসীতিরুতলে চেতঃ সমুৎকন্ঠতে।

৬. কোপো যত্র ভ্রকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং

যত্রন্যোন্যস্মিতমনুনয়ো দৃষ্টিপাতঃ প্রসাদঃ।

তস্য প্রেমণস্তিদিদমধুনা বৈশসং পশ্য জাতং

ত্বং পাদান্তে লুঠসি ন চ মে মনুমোক্ষঃ খলায়াঃ।

৭. পরস্পর দ্বাষাম্মোক্ষঃ। অর্থশাস্ত্র, ধর্মস্থীয়, (৩:১৬)

৮. উন্মত্তং পতিতং কীবর্মবীজং পাপরোগিণং ন ত্যাগোস্তি দ্বিষস্ত্যাশচ ন চ দায়াপবর্তমান। মনু (৯:৭৯) মদ্যপা সাধুবৃত্তা চ প্রতিকুল চ যা ভবেৎ। বধিতা বাধিবেত্তব্য হিংস্রাথায়ী চ সর্বদা। মনু (৯:৮০) আধিবিন্না তু যা নারী নির্গাচ্ছেদূষিতা গৃহৎ। সা সদ্যঃ সংনিরোদ্ধব্যা ত্যাজা বা কুলসংনিধৌ। মনু (৯:৯৩)

৯. ঋগ্বেদ (৭:৭৬:৩)-র ভাষ্যে, ‘পতিং পরিত্যজোিতস্ততঃ সঞ্চয়ন্তী ব্যাভিচরন্তীতি।’

বিচ্ছেদ

বহু কারণে দাম্পত্য অচল অবস্থায় পৌঁছতে পারে। আগেই দেখেছি পরিবার বা সমাজের প্রতিকূল অভিমত, পারিবারিক দায়িত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা, স্ত্রীর পরিবারে স্বামীর সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বা স্ত্রীর প্রতি শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে স্বামীর নিষ্ক্রিয়তা, সন্তান চাই কিনা, কটি চাই, কখন চাই সে বিষয়ে মতানৈক্য, যৌনমিলনে নানা অসন্তুষ্টি, আর্থিক অসাচ্ছন্দ্য, আদর্শগত পার্থক্য, রাজনীতিবোধে দ্বিমত, রুচিদ্বৈধতা, ছোটখাট ব্যাপারে দুটি স্বভাবের নানা পার্থক্য যা স্ফীত হতে হতে দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে–এ ছাড়াও নানা খুঁটিনাটি নিয়ে পরস্পর-বিমুখতা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে তার একমাত্র সমাধান রূপে দেখা দেয় বিবাহ বিচ্ছেদ। কত পুরুষ ও নারীকে বলতে শোনা যায়, ‘নাঃ, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। ওর সঙ্গে আর এক দণ্ড থাকতে পারব না। ওই সংসারে দম বন্ধ হয়ে আসছে।’

এ অবস্থা কাল্পনিক নয়। খুব বেশি দাম্পত্যে পরস্পরের প্রতি যথার্থ ঔদাসীন্যের সম্পর্ক স্থায়ী হয় না, যদি না দাম্পত্য সম্বন্ধে তাদের প্রত্যাশাই কম থাকে। যে সম্পর্কের ভিত্তি প্রেম সেখানে প্রেমের মৃত্যু ঘটলে প্রায়ই দেখা যায় বিদ্বেষ এবং তখন পরস্পরের সান্নিধ্য অসহ্য হয়ে ওঠে। অনেক দম্পতি অবশ্য এ অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে হিসেব করে দেখেন সন্তানের জন্যে অথবা সন্তান না থাকলে পরিবার বা সমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়াবার জন্যে দাম্পত্যের কাঠামোটা বজায় রেখে চলাই ভাল। কখনও বা এর মধ্যে আর্থিক

স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধে, ইত্যাদিরও হিসেব হয়। অনেক বড় চাকরিতে বড় কতাঁদের স্ত্রীর একটা আবশ্যিক ভূমিকা থাকে পাটিতে; অর্থাৎ দাম্পত্য অটুট থাকার চেহারাটা বজায় রাখার বৃক্তিগত প্রয়োজন থাকে; সে সব ক্ষেত্রে স্ত্রী রাজি থাকলে অভিনয়টা চলে। আবার কখনও প্রেমের মৃত্যু ঘটলেও, আবেগের দিকটা ছাড় হয়ে গেলেও, যৌন সম্পর্কের দিকটা স্তিমিত হয়ে এলেও, বা না হলেও, এক ধরনের একটা মমতা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, কখনও উভয়েরই কখনও বা একজনের প্রবল সন্তানবাৎসল্য বিচ্ছেদ ঠেকিয়ে রাখে। যেখানে এ মনোভাব অনুপস্থিত সেইখানেই বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়। আর একটা কারণে ইদানীং বহু সংসারে দাম্পত্য কলহ বাড়ছে, সেটা হল সংসারে গৃহকর্ম এক মেয়েটিকেই সামলাতে হয়। উচ্চবিত্ত পরিবারের পক্ষে অত্যধিক পারিশ্রমিক দিয়ে লোক নিযুক্ত করে এবং গৃহকর্মনির্বাহ করা সম্ভব। নিম্নবিত্ত পরিবারে ধরে নেওয়াই হয় যে বাইরে কাজ করলেও আর্থিক অসঙ্গতির জন্যে গৃহকর্মে বাইরের লোকের সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়; তাই সমস্ত চাপই বধুটির এবং একটু বড় ছেলেমেয়ের ওপরে পড়ে। মধ্যবিত্ত মানসিকতটা ভৃত্যনির্ভর, কাজেই এখন বাইরে চাকরি করে যে বাধুটি, সে জানে বাড়ি ফিরে অধিকাংশ গৃহকর্ম তাকেই সমাধা করতে হবে। এখনও মধ্যবিত্ত পুরুষের মানসিকতাটা এতটা মার্জিত নয় যে স্ত্রীকে গৃহকর্মে সাহায্য না করাটা যে পুরুষের পক্ষে যথার্থ পৌরুষের অভাব এবং মানসিক দৈন্য, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাই সূচিত করে তা উপলব্ধি করবে, এবং লজ্জা বা অপমান বোধ করবে এবং গৃহকর্মে স্ত্রীর সঙ্গে সমান ভাবে হাত লাগাবে। দোকানবাজার, বাসনামাজা, শিশুর সর্বাঙ্গীণ পরিচর্যা করা, ঘরমোছা, ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সমস্ত গৃহকর্মে সমান অংশ নেওয়াতেই যে পুরুষটির মানবিক মর্যাদা রক্ষিত হয়, অন্যথা যে সে মানুষ হিসেবে হেয় বলে প্রতিপন্ন হবে এ কথা স্মরণ রেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসে স্ত্রীর সঙ্গে সমানে সব কাজ করা উচিত। খুব বিরল হলেও এর দৃষ্টান্ত ইদানীং কিছু আছে এবং সুখের বিষয়, ধীরে ধীরে হলেও এ দৃষ্টান্ত

বাড়ছে। হয়তো এর একটা কারণ হল, কিছু কিছু ভারতীয় পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে এ ধরনের দাম্পত্য সাহচর্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আবার যাদের 'অন্তজা।' বলে ঘৃণা করা হয় তেমন নিচু জাতের মধ্যে এমন উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

এ মনোভাব এবং গৃহকর্মে সাহায্যের এ উদ্যম স্বাভাবিক ভাবেই আসে যদি দাম্পত্য হয় প্রেমনিষ্ঠ। ভালবাসার মধ্যেই নিহিত থাকে সহানুভূতি এবং তা থাকলে স্ত্রীর কষ্ট লাঘব করার জন্যে স্বামীর স্বতঃউৎসারিত উৎসাহ আসবে। যেখানে মৌলিক ভালবাসার অন্তরালে থাকে পুরুষের মর্যাদা সম্বন্ধে বাসি বস্তাপচা ধারণা, যার বশে পুরুষ কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরা স্ত্রীকে চায়ের ফরমাস করে এবং সিগারেট টানতে টানতে চেয়ে দেখে ক্লান্ত স্ত্রীর ফের একদফা পরিশ্রমের ভূমিকা, সেখানে সে স্বামী সিনেমার টিকিট বা শাড়িগয়না দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করলেও স্বামীর স্বার্থপর নিস্ক্রিয় আলস্য দেখে স্ত্রীর মনে যে স্বাভাবিক অভিযোগ পুঞ্জিত হতে থাকে, সেটা গভীর ক্ষোভে পরিণত হয়, কখনও বা ফেটে পড়ে আক্রোশে। সে দিন দারুণ দুঃখ দিন। স্বামী নিশ্চিত জানে যে, স্ত্রী স্বামী এবং সন্তানদের অভুক্ত রাখতে পারবে না; কাজেই গৃহকর্ম পড়ে থাকবে না। পড়ে থাকেও না, কিন্তু তাতে দাম্পত্যের মর্মমূলে যে আঘাত লাগে তার কোনও প্রতিকার নেই। স্ত্রী যদি তখন বোঝে যে তার কষ্টে, পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে, ঘরে বাইরে একক পরিশ্রমের গ্লানিতে স্বামী বিচলিত নয়, তা হলে প্রকৃত অর্থে আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন সেই স্বামীর সম্পর্কে তার শ্রদ্ধায় চিড় লাগে এবং ধীরে ধীরে দাম্পত্য ক্লিষ্ট ও কলুষিত হয়। যত্রতত্র ভুল ইংরেজি বলে, বুঝে না বুঝেইংরেজি ছবি দেখে, মামি ড্যাডি'র বকুনিতে বিগলিত যে অপসংস্কৃতিতে পুষ্ট আজকের মধ্যবিত্ত মানস, তার মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের সুস্থ দিকগুলি এখনও পৌঁছল না। তারা চোখ মেলে দেখলো না অধিকাংশ পাশ্চাত্য পরিবারে পুরুষ গৃহকর্মে কোনও গ্লানি বোধ করে না, স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বাসন ধোয়, মোছে, রান্নাও করে শিশুর সেবাযত্নও করে।

এইখানে যদি এদেশি নারী দাবি করে স্বামী তার পারিবারিক শ্রমের অর্ধাংশ বহন করুক, তবে সেটা তো একেবারেই অযৌক্তিক দাবি নয়। এবং এ সাহচর্য না পেলে যদি তার দাম্পত্যে অতৃপ্তি জন্মায়, তবে তা নিতান্তই স্বাভাবিক। কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরেই গোরস্থালির জোয়ারে 'স্বেচ্ছায়' নিজেকে যুক্ত করে যে সব নারী তাদের উচ্চকণ্ঠে যে প্রশংসা করা হয় তা সম্পূর্ণ ভাবেই পুরুষের স্বর্থ-প্রণোদিত নীচতার প্রতীক। তার বদলে যদি অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হত সেইসব পুরুষের, যারা গৃহকর্মে স্ত্রীর ভার লাঘব করবার জন্যে বহু কাজ স্বেচ্ছায় করে, তবে স্ত্রীই যে শুধু সহানুভূতি ও মানসিক আশ্রয় পেত। তাই নয়, দাম্পত্য ছন্দপতন ঘটত না এবং ছেলেমেয়েরাও ভিন্নতর, সুস্থতর একটি মূল্যবোধের পরিবেশে লালিত হত; তারাও বুঝত যে, কোনও শ্রমই মানুষকে, পুরুষকেও–হীন করে না, বরং স্বনির্ভর হতে শেখায় এবং তার একটা নিজস্ব গৌরব আছে। এ ধরনের সহমর্মিতায় দাম্পত্যের মর্যাদা অনেক বাড়ে।

বিবাহ হলেই বিচ্ছেদের প্রশ্ন ওঠে এবং এ প্রশ্ন সঙ্গে নিয়ে আসে বহুতর জটিল সমস্যা; সেই কারণে বিবাহ এবং বিবাহ অনুষ্ঠানটিই বাহুল্য এই বোধে এখন বহু তরুণ তরুণী বিবাহ সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে উদাসীন হয়ে উঠেছে। তাদের মতে যদি প্রেমই হয় বিবাহের ভিত্তি, তবে তার ওপরে ধর্মানুষ্ঠানের গোবরজল ছড়া দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বহু শতাব্দী পূর্বে গান্ধর্ব বিবাহকে স্বীকার করে এ দেশের সমাজই তো এ কথা মেনে নিয়েছিল। আইনের সমর্থন সম্বন্ধে এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আমরা সন্তান চাইনা, যদি কখনও চাই তখন আইনের সমর্থন চাইব সন্তানের বৈধতার জন্যে।' অন্য কেউ কেউ বলে 'শিশু কোনও অবস্থাতেই অবৈধ নয়, সংসারে যে এসেছে, রাষ্ট্র তার দায়িত্ব নিতে বাধ্য। পিতামাতা চাইলে এবং পারলে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নোবে, না পারলে রাষ্ট্র নেবে, কিন্তু তাকে অবৈধ বলা চলবে না।' অর্থাৎ সামাজিক বা আইনের সমর্থিত বিবাহের ছাপ নিষ্প্রয়োজন। ওই ছাপে সন্তান

এক ধরনের স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা পায় এ কথা তো সত্যই। পিতৃপরিচয়, পারিবারিক পরিচয় শিশুকে এক বৈধ স্বীকৃত নাগরিকের মর্যাদা দেয়। এখন যারা বলছে এটা নিষ্প্রয়োজন, তারা বলছে সর্ব অবস্থাতেই শিশুর ওই মর্যাদা প্রাপ্য, তার অবিবাহিত জনকজননীও যে তার জন্মদাতা জন্মদাত্রী, সেই পরিচয়ই যথেষ্ট, তারা বিবাহিত কিনা সেটা অবান্তর। এ জন্যে এখনও সমাজ যে অবস্থায় আছে তাতে রাষ্ট্রের অ-সমর্থন যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। বিবাহ যদিও দুটি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তবুও রাষ্ট্রও এতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। মেহতা লিখছেন, 'বিবাহ হল পরিবার সৃষ্টির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি সংবিধানসম্মত মিলন। এই কারণেই রাষ্ট্র এই মিলনে উৎসাহী এবং এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার কর্তব্য নিজে স্বীকার করে নেয়।'(১) বিবাহ অর্থাৎ রাষ্ট্রসমর্থিত নারী পুরুষের মিলন থেকে সন্তান এলে একটি পরিবারের সূচনা হয়, যা ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে বৃদ্ধিলাভ করে। অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক একক সেই পরিবার; কাজেই তা যেন সমাজের নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে প্রবর্তিত হয়। সে স্বার্থ সমাজ তথা রাষ্ট্রেরই। বিবাহ রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়। যারা রাষ্ট্রের ও সমাজের এই ছক অস্বীকার করে, স্বভাবতই রাষ্ট্র তাদের সম্বন্ধে দায়িত্ব নিতে চাইবে না। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, সমাজে বিবাহের দ্বারা যে একটি পারিবারিক একক সংযুক্ত হচ্ছে এতেই রাষ্ট্রের সন্তোষ এবং এই জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রে বিবাহের একটা স্থান আছে; নতুবা একটি বিবাহের সঙ্গে রাষ্ট্রের সরাসরি প্রত্যক্ষ অন্য কোনও যোগ নেই। যখন দুটি পক্ষ তাদের মিলিত হওয়ার বাসনাকে প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করে তখন বিবাহ সংক্রান্ত খুব প্রগতিশীল আইনও তাতেই তুষ্ট হয়।'(২) কাজেই বিবাহের একটা প্রান্তে দুটি ব্যক্তি থাকলেও অপর প্রান্তে পরিবার, এমনকী সমাজকেও অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক রাষ্ট্রেরও একটা ভূমিকা লক্ষিত হয়। এই কারণে আদিম যুগে মানুষ যৌনমিলনের ব্যাপারে যে স্বাধীনতা ভোগ করত, এখন আর তার সে স্বাধীনতা নেই। যা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার সে আচরণ নিয়ে দম্পতিকে জবাবদিহি করতে হয় রাষ্ট্রের কাছে। রাষ্ট্র খবরদারি করে যেন

তার যৌন বা দাম্পত্য আচরণ রাষ্ট্রের কোনও ক্ষতিসাধন না করতে পারে। অথচ যৌন আচরণের অন্য দিকটায় পুরুষের পক্ষে অবাধ স্বাধীনতা: গণিকাগমন, পরস্ত্রীগমন, ইত্যাদির জন্যে তাকে কোথাও জবাবদিহি করতে হয় না। নারীর এ অর্থে কোনও প্রকাশ্য ও যথার্থ বিকল্প ক্ষেত্র নেই যেখানে সে তার অতৃপ্ত যৌনকামনা চরিতার্থ করতে পারে। এই হল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আইনের চোখে নারীপুরুষের বৈষম্যের একটা প্রকাশ। এবং রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে নারীর এই অবনমন হল সামাজিক পরিবেশে নারীর অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের অভাবের ফল–হেতু নয়। অর্থাৎ, 'অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকেই আইনের দৃষ্টিতে এই দুজনের, নারী ও পুরুষের যে বৈষম্য পূর্বপুরুষের সামাজিক উত্তরাধিকার হিসেবে এসেছে, তা নারীর অর্থনৈতিক নির্যাতনের কারণ নয়, কার্য বা ফল মাত্র।'(৩)

বিবাহিত জীবনে দম্পতির মধ্যে নানা সমস্যা দেখা দেয় যা বিশেষ ভাবে দাম্পত্য জীবনেরই সমস্যা। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, যে-কোেনও দু'জন মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই সংঘাতের ও সমস্যার অবকাশ আছে। বাবা মা ছেড়ে মেয়েদের মধ্যে, ভাইবোনের মধ্যে, মাসি-পিসি-জেঠি-খুড়ির সঙ্গে, ভাইপো-ভাইঝি-বোনপো-বোনঝিদের সঙ্গে, জ্যাঠা-খুড়োমামা-মেসোর সংঘাত একটুও অপরিচিত নয়। এমনকী দুই প্রজন্ম পেরিয়েও কখনও কখনও দিদিমা-দাদু, ঠাকুমা-ঠাকুরদার সঙ্গেও নাতি-নাতনির সংঘর্ষ ঘটে থাকে। সে দিক থেকে দেখলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ বা অনৈক্য স্বতন্ত্র কিছু নয়। কিন্তু পৃথিবীর এই একটি মাত্র আত্মীয়তা। যা রক্তের সম্পর্কের ওপরে দাঁড়িয়ে নেই। সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, রক্তের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত দুটি মানুষকে হিসেব করে পূর্ব পরিকল্পনার ফলে কাছাকাছি আনা হয় বা তারা স্বেচ্ছায় কাছাকাছি আসে। এখানে চেষ্টা করলেও বিবাহোত্তর জীবনের সংঘাত এড়ানো যেত না; খুব মধুর সূচনার পরেও তিক্ততা আসতে পারে এবং অত্যন্ত সাদামাটা ব্যবহারিক সূচনার পরেও গভীর প্রেমের মাধুর্য আসতে পারে। এই একটি মাত্র

সম্বন্ধ যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে নতুন মানুষ আসে এবং যাকে অবলম্বন করে বহু মানুষ আশ্রয়, সাহচর্য লাভ করতে পারে। অতএব এ সম্পর্কটি যদি প্রেমের ভিত্তিতে এবং কিছু প্রলম্বিত পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, যাতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ রুচি বা আদর্শের সংঘাত দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তা হলে এই সম্পর্কটিতে যথার্থ আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠতে পারে। অবশ্য পরে সম্পর্কটি নষ্ট হওয়ার, অর্থাৎ পূর্বপ্রেমের মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা ঠেকানো যায় না, তবু হয়তো আনুপাতিক ভাবে সে সম্ভাবনা কিছু কমে।

বিবাহে যে দুটি মানুষ কাছাকাছি আসে তারা তাদের দেহ ও মন নিয়েই পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, এর যে নানা অনুসঙ্গ তা অনেক সময়ে চাপা পড়ে যায় এর আইনগত দিকটির অন্তরালে। 'বুর্জেয়া ধারণা অনুসারে বিবাহ একটা চুক্তি, একটা সংবিধান সংক্রান্ত ব্যাপার, এবং সত্যিই এ ধরনের ব্যাপারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা সারা জীবনের মতো দুটি দেহ ও মনের একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।'(৪) এই সম্পর্কটির নানা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোনও সম্পর্কেই থাকে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজে ও পরিবারে বহুধাব্যাপ্ত, বহু গভীরে প্রোথিত। এদের মূল এবং জীবনের বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে এগুলির প্রসার। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জীবনে বহু গঠনমূলক বা ধ্বংসমূলক প্রভাব আনতে পারে, যা অন্য কোনও সম্পর্কে কেউই তেমন ভাবে বিশেষ আনতে পারে না। মা বাবার প্রভাব সন্তানের জীবনে নিশ্চয়ই খুব ব্যাপক হতে পারে, কিন্তু এ প্রভাব সন্তানের জন্ম থেকেই শুরু হয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে এবং কিছুকাল পরে প্রত্যক্ষত এ প্রভাব আর থাকে না; সন্তানের স্বতন্ত্র একটি ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। পারস্পরিক প্রভাবের কালসীমা হ্রস্বতর এবং ব্যতিক্রমী কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া, এ প্রভাবের গুরুত্বও তেমন বেশি নয়। কিন্তু স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জীবনে প্রবেশ করবার পর থেকেই দু'পক্ষই নতুন একটি মানুষের জীবনবোধ, রুচি, আদর্শ, স্নেহমমতার প্রকাশ

ও ক্ষেত্র, সহমর্মিতার গভীরতা ও অধিকার এ সব সম্পর্কেই এমন স্পর্শকাতর থাকে যে পারস্পরিক প্রভাব–ভাল, মন্দ অথবা মিশ্র–অতি দ্রুত অনুভূত হয় এবং সে প্রভাব দুটি জীবনের পরিসরে সুদূরপ্রসারী হয়। কখনও কখনও তা অতি তীব্র ভাবে লক্ষিত হয়। ১৭৯২ সালেই মেরি উলস্টোনক্রাফট বলেছিলেন, 'দুটি লিঙ্গের মানুষ পরস্পরকে নষ্ট অথবা উন্নত করে।'(৫) এই আর একটা কারণেও দাম্পত্যের সামাজিক গুরুত্ব এত বেশি। দুটি মানুষ পরস্পরের নিকটতম সাযুজ্যে এসে ক্রমে ক্রমে নীতিনিষ্ঠ, আদর্শের অনুসারী উন্নততর মানুষে পরিণত হতে পারে, আবার একে অন্যের নীতিভ্রষ্টতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রমে স্বার্থসংকীর্ণ দুর্জনেও পরিণত হতে পারে। তৃতীয় পরিণাম, অন্য পক্ষের অশুভ প্রভাব থেকে সরে থাকার দুঃসহ নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা সারাজীবন বহন করে চলতে বাধ্য হওয়া। যেমন গান্ধারী, হয়তো বা মন্দোদরীও। এই সম্পর্কটি দুটি মানুষকে এত কাছাকাছি আনে যে মনের দিক থেকে সাহচর্য না পেলে সেটা মর্মান্তিক যন্ত্রণারই হতে পারে। এ দুঃখ প্রাকবিবাহ পর্বে নিবারণ করবার কোনও উপায়ই নেই, শুধু যথাসম্ভব একে অপরের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে জেনে নেওয়া যে দৈনন্দিন জীবনে রুচি, আদর্শ বা মূল্যবোধের সংঘাত অসহ্য হয়ে উঠবে কিনা।

এ প্রসঙ্গে দুটি কথা সত্যি। জীবনের অন্যান্য কিছু সম্পর্কেও আন্তর-বিরোধ দুর্বহ হয়ে উঠতে পারে। তবে ডিভোর্সের মতো প্রকাশ্য এবং কষ্টকর পদ্ধতি ছাড়াও তেমন অধিকাংশ সম্পর্ক থেকেই পরিত্রাণের উপায় আছে। যদি একে অপরের ওপর আর্থিক বা শারীরিক ভাবে নির্ভরশীল হয় (রোগে, পঙ্গুতায় অথবা মস্তিষ্কবিকৃতিতে) তা হলে এ ধরনের মুক্তিও দুস্তপ্রাপ্য হয়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্র অবশ্য এখন এ ধরনের অনেক পরিস্থিতিতেই দায়িত্ব নিচ্ছে; আশ্রয় এবং/বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করাচ্ছে। কিন্তু দম্পতির মধ্যে পরস্পরনির্ভরতার অনুষঙ্গ অনেক বেশি গভীর ও জটিল, ফলে বিচ্ছেদও সেই অনুপাতে দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়ত, আইন যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাতে গোড়া থেকেই

বিচ্ছেদ অনিবার্য বলে ধরে না নেওয়া হয়। সব কিছুই ভাঙা অনেক সোজা, জোড়া বা জুড়ে রাখা অনেক কঠিন। তাই বহু দম্পতিই আন্তর-দূরত্ব মেনে নিয়েও কাজ-চলা-গোছের একটা আপোষ করে নেন, এতে হয়তো সন্তানরা পারিবারিক আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হওয়ার দুঃখটা পায় না। তবে সেটাই যে সব ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় তা নয়, কারণ স্বভাবে উগ্র বা অসহিষ্ণু বা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হলে অনেক ভাঙা পরিবারে, যে ধরনের কলহ ও উচ্চগ্রামে পরস্পরকে দোষারোপ চলতে থাকে, কখনও বা রুচি ও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেও–তার মধ্যে যে সন্তান বেড়ে ওঠে সে কি সুস্থ পরিবেশ পায়? এ সব ব্যাপারে অবশ্য প্রত্যেক দম্পতিকে পরিস্থিতি অনুসারে স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, কোনও সাধারণ সূত্রই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দাম্পত্য জীবনে কোনও বিপত্তি দেখা দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীকে দোষ দেওয়া হয়। দাম্পত্য সুখও যেন একা নারীরই হাতে, 'সে স্বামীর মতের অনুবর্তিনী হলেই গৃহে সুখ থাকে, গৃহাশ্রমের তুল্য কিছুই হয় না। যদি নারী স্বামীর বাশানুগা হয়।'(৬) দাম্পত্য বিরোধে স্বামীর কোনও দায়িত্ব নেই, কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী পুরুষের ছায়েবানুগামিনী হবে এইটেই আপেক্ষিত; নারীর কোনও ব্যক্তিত্ব, মতস্বাতন্ত্র্যের কোনও অবকাশই শাস্ত্র রাখেনি। অথচ সাহিত্য কিন্তু অন্য কথা বলে। গান্ধারী প্রকাশ্য রাজসভায় স্বামীর মতের বিরোধিতা করেছেন, দ্রৌপদী স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ধর্ম নিয়েই তর্ক করেছেন। গঙ্গা, শকুন্তলা ও সত্যবতী নিজেদের শর্তে বিয়ে করেন; মহাভারতে শকুন্তলা প্রকাশ্য রাজসভায় দুষ্যন্তকে নানা ভাবে ভর্ৎসনা করেন।(৭) তার চেয়েও বড় কথা অরুন্ধতী স্বামী বশিষ্ঠকে সন্দেহ করে ত্যাগ করে যান।'(৮) অনসূয়া স্বামী অত্রিকে ছেড়ে যান এই বলে যে, 'আমি কোনও মতেই ওর বশে থাকব না।'(৯) দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারা স্বামীকে ত্যাগ

করে সোমের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে বাস করেন। সোমের পুত্র বুধ জন্মানোর বেশ কিছুকাল পরে ওই ছেলেকে নিয়েই বৃহস্পতির কাছে আসেন ও দু'জনে আবার এক সঙ্গে বাস করতে থাকেন।'(১০) সুগ্রীবের স্ত্রী তারা বালীর সঙ্গে বাস করার পরে আবার সুগ্রীবের কাছে ফিরে আসেন। এমন আরও বেশ কিছু নিদর্শন আছে যেখানে নারীর আচরণে শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য পাই সাহিত্যে। এটা জানা যে, সমাজ নারীর কাছে যা প্রত্যাশা করে সেই নিরিখেই শাস্ত্র রচিত হয়, কিন্তু সাহিত্য জনমানসে দীর্ঘকাল সঞ্চরমাণ বহু কাহিনির মধ্যে বেঁচে থাকে, ফলে লিপিবদ্ধ হয়ে যখন তা স্থায়িত্ব লাভ করে তখন শাস্ত্র বচনের সঙ্গে না মিললেও নিজের সত্য সত্তার জোরেই তার পরমায়ু অক্ষয় হয়। তাই অনুজ্ঞা ও আচরণে বৈষম্য থেকে যায়। অনুজ্ঞা বলে স্ত্রীর নিজস্ব মত থাকবে না, সে স্বামী ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের নিষ্প্রতিবাদ পরিচর্যা করেই জীবনে চরিতার্থতা লাভ করবে; স্বামীই তার ইহপরকালের প্রভু। 'স্ত্রী স্বামীর হাতে নিজের সম্পূর্ণ সত্তর ভার দিলেই স্বামী তাঁর জীবনে তাৎপর্য এনে দেবেন।(১১) এটা এখনও অধিকাংশ সমাজের অনুক্ত প্রত্যাশা। স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের একমাত্র প্রভু, যিনি স্ত্রীর সত্তকে অর্থপূর্ণ করেন। কী ভাবে? তাকে পত্নীর আসনে স্থান দিয়ে। এতে শুধু যে নারীর সহজাত মানসিক নূনতা প্রতিপন্ন হচ্ছে তা নয়, সে ন্যূনত পূরণের একমাত্র উপায় যে বিবাহ, তাও সংকেতিত হচ্ছে। এই বোধই সহমরণের নির্দেশের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এবং সহমরণ শুধু প্রাচীন ভারতবর্ষেই আচরিত হত না, অন্যত্র এর বেশ কিছু দৃষ্টান্ত মেলে। 'থ্রেসে স্বামীর মৃত্যুর পর তার সমাধির ওপরে তার নিকটতম আত্মীয় স্ত্রীকে বধ করে দুজনকে এক সঙ্গে সমাধিস্থ করত।'(১২) 'গলদের মধ্যেও স্ত্রীর জীবনমৃত্যুর ওপরে স্বামীর প্রভুত্ব ছিল এবং বিধবার আত্মহনন বাধ্যতামূলক ছিল।'(১৩) বিগত তিন হাজার বছরের যে ইতিহাস পাওয়া যায়। তাতে দাম্পত্য সম্পর্ককে বিশেষিত করেছে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব যাতে এ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী ব্যাপারে একটা রাজাপ্রজা মনোভাব উভয়েই মেনে নিয়েছে। এখনও বহু পরিবারে পুরুষের অনস্বীকার্য শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নারীর

বিশ্বাস আছে। এ বিশ্বাস সে সমাজ ও পরিবারের সুদীর্ঘ বিবর্তনের উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে–তার মা-দিদিমা, শাশুড়ি-ননদ প্রতিবেশিনীদের নিদ্বিধায় বারংবার উচ্চারণের দ্বারা এটা তার মধ্যে অলক্ষ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই বিশ্বাস 'শুধুমাত্র স্বামীর লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যকেই প্রাধান্য দিয়ে প্রভুত্বের অধিকার হিসাবে স্বীকার করে স্বামীর অহমিকাকে পুষ্ট করেছে।'(১৪) এ ধারণার পশ্চাতে কার্যকরী আর একটি ধারণা, তা হল নারী মাত্রই পুরুষের তুলনায় হীন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষপ্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখবার জন্যই এই ধারণাটি সৃষ্টি ও প্রচার করেছে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় আজ এ ধারণার ভ্রান্তি ধরা পড়েছে এবং ক্রমেই এটি ভ্রান্ত বলে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষিত মানসে প্রতিভাত হচ্ছে। স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, 'এ কথা ঠিক নয় যে, লিঙ্গের প্রকৃতিই তাদের বর্তমান কর্মক্ষেত্রে ও (সামাজিক) অবস্থানের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ায়, এবং তাদের এগুলির উপযুক্ত করে তোলে।(১৫) অথচ লিঙ্গগত বৈষম্য যে পরিবারে ক্ষমতা, প্রাধান্য, দায়িত্বের, বৈষম্যের ভিত্তি এমনই একটি ধারণা নারীপুরুষ নির্বিচারে সকলেরই অবচেতনে অল্পবিস্তর কার্যকর; এবং এর ফলেই এ ধরনের বৈষম্য মেনে নিয়েই পরিবারের পত্তন হন।

এই বৈষম্য মেনে নেওয়ার ফলে পরিবারে নারীর অবদান একটি অনুচ্চারিত (মধ্যে মধ্যে সরবে উচ্চারিতও)। মূলসূত্র। নারীর হীনতা সম্বন্ধে বোধ এত গভীর ও এমন ব্যাপক যে নারীর পক্ষে সুবিচারের আশা করাই ধৃষ্টতা। ফরাসি বিপ্লবের পরে যে সংবিধান রচিত হয় তার সম্বন্ধে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, সংবিধান কিছু ব্যক্তিকে অন্যদের চেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছে, কিন্তু নারীকে কিছুই দেয়নি।'(১৬) এই ধরনের বৈষম্য পৃথিবীর সকল দেশে বহু যুগ ধরে চালিত আছে অথচ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমীক্ষা বলে 'পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক নারী; এরা পৃথিবীর মোট শ্রম-প্রহরের দুই তৃতীয়াংশ

পরিশ্রম করে; পৃথিবীর উপার্জনের এক দশমাংশ ভোগ করে; এবং পৃথিবীর সম্পত্তির এক শতাংশেরও কমের অধিকারিণী।' এমন এক ভয়াবহ চিত্র সম্ভবই হত না, যদি না নরনারী নির্বিচারে মানবমনের অবচেতনে নারীর হীনতা সম্বন্ধে ধারণা, সুদীর্ঘকাল ধরে পুঞ্জিত হয়ে থাকত। নারীর ন্যূনতা প্রকৃতিদত্ত, এই বিশ্বাসের ফলেই নারীর স্থান দাম্পত্যে, পরিবারে ও সমাজে পুরুষের নীচে। এই হীনতা প্রমাণ করার কোনও দায় কেউ কোনও দিন বোধ করেনি, ফলে স্বতঃসিদ্ধের মতো এ বোধ নারী ও পুরুষ মেনে নিয়েছে এবং পুরুষ কোনও দিন চিন্তা করেনি যে, দাম্পত্যে নারীর সমানাধিকারের প্রশ্ন উঠতে পারে। এই অধিকার না থাকার ফলে নারীর অন্তর্জগৎ কী পরিমাণে বিধ্বস্ত, বিষাদগ্রস্ত ও হতাশাময় হতে পারে তা নিয়েও সে কখনও ভাবেনি।

কদাচিৎ এমন দম্পতি দেখা যায় যেখানে স্ত্রী আপনি যোগ্যতায়, বিদ্যাবুদ্ধি ও কৃতিত্বে স্বামীর ওপরে স্থান পেয়েছে। এ রকম ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্বামী হীনম্মন্যতায় ক্লিষ্ট এবং তাদের অনেকেই বিদ্রুপ বক্রোক্তি ও কর্কশ ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর বশ্যতা অর্জন করবার চেষ্টা করে। এই অসাম্যের একটা দৃষ্টান্ত হল স্ত্রী যদি কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থও হয়, তার বদলি হলে কদাচিৎ স্বামী তার কর্মক্ষেত্রে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বাস করে। অপরপক্ষে স্বামীর বদলি হলে কর্মরতা। স্ত্রী কাজে ইস্তফা দিয়ে স্বামীর কর্মস্থলে চলে যাবে, এইটেই সাধারণ ভাবে অপেক্ষিত। কিছু কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে এবং ইদানীং তা বাড়ছে: বেশ কিছু দম্পতি এখন যে যার কর্মস্থলে একই থাকেন, ছুটিতে একত্র হন। ব্যবস্থাটি বাঞ্ছনীয় নয়, তবে যে পর্যন্ত না উভয়ের কর্মস্থল এক জায়গায় আনা সম্ভব হয়–যদি তা আদৌ হয়–ততক্ষণ এটি হয়তো পূর্বের সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশি খারাপ নয়। এখানে অন্তত স্ত্রীর কর্মের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি আছে, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যার প্রয়োজন প্রশ্নাতীত। নারী ও পুরুষের পক্ষে বিবাহের অর্থ বা অনুষঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক নয়। বিবাহের জৈব, আবেগগত, মানসিক

প্রয়োজন নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে মূলত একই, কিন্তু এই প্রয়োজনগত সাম্য পারস্পরিক সম্পর্কে কোনও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।'(১৭) এখনও বিবাহ নারীর পক্ষে অনেক বেশি গুরুভার, অনেক বেশি দায়িত্বের প্রতীক। পুরুষ বিবাহকে গৃহ এবং গৃহিণী পাওয়ার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু এখন পুরুষের পক্ষে এই দুইয়ের দায়িত্ব এতটা দৃঢ় নয় যে, তার থেকে সে সরে যেতে পারে না। বস্তুত, সরে যাওয়ার বহু পথ তার সামনে ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই খোলা। 'সে (পুরুষ) গৃহ ও গৃহিণী চায় কিন্তু এ দুই থেকে পলায়নে স্বাধীনতাও তার চাই।'(১৮) সিমোন দ বোভোয়া এই প্রসঙ্গে চূড়ান্ত অত্যুক্তি করেছেন এই বলে যে, 'বলা হয় বিবাহ পুরুষকে খর্ব করে। এ কথা প্রায়শই সত্য, কিন্তু প্রায় সর্বদাই বিবাহ নারীকে ধ্বংস করে।(১৯) এই মতের শেষ প্রান্তে আছে বিবাহ প্রেমকে হত্যা করে আসলে পবিত্র দাম্পত্য স্বর্গেই রচিত হয়; ঈশ্বর নির্বাচিত বর বধূই মর্ত্যে মিলিত হয়; জ্যোতিষ শাস্ত্রের নির্দেশে রাজযোটক মিলন ঘটে। নানাদি অলৌকিক বিভায় মণ্ডিত দাম্পত্যকে ওই কৃত্রিম গৌরব থেকে মুক্ত করে বাস্তব পরিস্থিতিতে এর যথার্থ রূপ ও বহু বিচ্যুতি, বহু কলঙ্ক এবং নিতান্ত স্বার্থসংকীর্ণ উদ্দেশে সংঘটিত এই বিবাহকে অনলংকৃত রূপে দেখবার চেষ্টাতেই বোভোয়া বিপ্রতীপ প্রান্ত থেকে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। এতকাল যাকে দিব্য বিভার পরিমণ্ডলে কৃত্রিম ভাবে স্থাপিত করা হয়েছিল, গ্রন্থকর্ত্রী দেখালেন তার মধ্যে বহু ফাক, বহু ফাকি। এবং বিবাহের দীর্ঘ জটিল ইতিহাস স্মরণে রাখলে এ দেখারও মূল্য আছে। এ-ও ভ্রান্ত দর্শনমাত্র নয়।

---

১. Marriage is a legalized union betwen man and woman entered into with a definite purpose of raising a family it is because of this purpose that the state is interested in the

union and takes upon itself the duty of regulating it. Indian Woman, p. 129

২. As far as marriage is concemcd, cven the most progressive law is fully satisfied as soon as the parties formally register their voluntary desire to get married Origin of Family, Private Property and the State, p 211.

৩. The inequality of the two (man and woman) before the law which is a legacy of the previous social conditions is not the cause but the effect of the cconomic opcression of woman Origin of the Fantly, etc. p 211

৪. According to bourgeoies conceptions matrimony was a contract, a legal affair, indeed the most important of all, since it disposed of the body and mind of two persons for life.' Origin of the Family, etc., p. 26

৫. 'The two sexes mutually corrupt and improve each other A indication of the Rights of Women p. 153

৬. পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দোহনুবর্তিনী সী। গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্যা বংশানুগা। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (৪.১)

৭. মহা. (১.৬৯.১-২৭)

৮. মহা. (১.২২৪.২৭-২৮)

৯. মহা. (১৩.১৪.৬৫-৬৭)

১০. দেবীভাগবত পুরাণ (১:১১)

১১. ‘She has only to put her existence in his hands and he will give it meaning.’ The Second Sex, p. 467

১২. Thracian wives were slain over the grave by the hand of their next of kun, and then buried with their husband. Herodotus. The Histories, IV 71

১৩. ‘Gallic husbands right on wives life and death and to the obligatory self-immolation of the widow.’ Caeser Galic War v. 19

১৪. Woman feeds man’s vanity as the dominant person lhe Second Sex. p. 208

১৫. ‘Neither does it avail to say that the nature of the two seves adapts them to their present functions and position and renders these appropriate to them.’ The Subjection of Women, p. 238

১৬. ‘The constitution gave some men more rights thanother, but gave none to women’–In the Company of Educated Women p. 11

১৭. The two sexes are necessity to each other but this necessity has never brought about acondition of reciprocity between then The Second Sex, p. 446

১৮. he wants to have hearth and honc while being free to escape therefrom.' প্রাগুক্ত; p 475

১৯. It has been said that marriage diminishes man, which is often true. but almost always it annihilates woman' 28; p. 496

শৃংখলা

শৃংখলা বিবাহ কী? বিশেষ ভাবে বহন করা? বি + বহ্ ধাতু + ঘঞ্? বিবাহ কি আত্যন্তিক ভাবে অনুষ্ঠান বা রাষ্ট্রবিধি নির্ভর? অর্থাৎ পুরোহিত, পাদরি বা মোল্লার মধ্যস্থতায় নিস্পাদিত একটি চুক্তি অথবা রেজিস্ট্রেশনে সম্পাদিত একটি পারস্পরিক চুক্তি? এইগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহে যে দুটি মানুষ যুগ্ম জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হয় তার মধ্যে পরে নানা অসংগতি ও বিরোধ দেখা দিতে পারে এবং অনেক সময়ে দেখা দেয়ও। 'কেহ কহাকেও লঙ্ঘন করিবে না।' ইত্যাকার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে একপক্ষ অপরকে লঙ্ঘন করে থাকে। যতক্ষণ মৃত্যু আমাদের না বিচ্ছিন্ন করে'। ততক্ষণ দুজনের পরস্পরের সঙ্গে সুখে দুঃখে, রোগে ভোগে একত্র থাকার অঙ্গীকার সত্ত্বেও বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবস্থাবিশেষে প্রেম অন্তর্হিত হওয়ার পরেও মৃত বিবাহের জের টেনে চলা গ্রিক পুরাণের সিসিফাস-এর দণ্ডের সমতুল্য হয়ে যায়— সে দণ্ডের কোনও প্রতিকার বা অবসান নেই। বিচ্ছেদ দেখা দেয়। কখনও দুজনের মধ্যে

কোনও তৃতীয়ের আবির্ভাবে কখনও বা উভয়ের যুগ্ম জীবনের মধ্যে কোনও এক বা একাধিক অসঙ্গতির ফাটল দেখা গেলে, কখনও আগন্তুক কোনও আঘাত বা মতদ্বৈন্ধে। কারণ যাই হোক, ধর্ম বা আইনের সামনে গৃহীত শপথের বন্ধন যে অক্ষয় নয় তা বারে বারেই দেখা গেছে। তা হলে দুটি মানুষের মিলিত জীবনের পক্ষে এ শপথ অপরিহার্যও নয়, ইষ্টসাধকও নয়।

অথচ অনাদ্যন্ত কাল ধরে নারী ও পুরুষ পরস্পরকে পেতে এবং সে পাওয়াকে স্থায়ী করতে চেয়েছে। এটা একটা সুস্থ স্বভাবিক চাওয়া, যার রূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য পাঁচ ছয় হাজার বছর ধরে সাহিত্যে চিত্রিত ও অভিনন্দিত হয়েছে; সে চিত্র মানুষকে মুগ্ধ করেছে, আগ্রহী করেছে। আপন উপলব্ধিতে এই মিলনকে পেতে, স্থায়ী করতে। তা হলে ধর্ম বা আইনের সমর্থন ছাড়াও এই মিলনের জন্য আকুতির একটি প্রকৃতিগত ভিত্তি আছে। ধর্ম বা আইন এ মিলনকে বাইরে থেকে একটা ছকের মধ্যে ভরে একে নিরাপদ ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করেছে। তাতে সমাজ স্বস্তি পেয়েছে। সন্তানরা এবং দম্পতিও এক ধরনের একটা নিরাপত্তা বোধ পেয়েছে। কিন্তু, এই মিলনের ভিত্তি যদি হয় একটি নারী ও একটি পুরুষের অন্তরের টান, তা হলে যথার্থ নিরাপত্তার ভিত্তি তো সেই অন্তরের টানেই। সেই টান যদি একদিন শিথিল হয় তা হলে আইন বা ধর্ম তখন বাইরে থেকে চাপানো বন্ধন মাত্র হয়ে ওঠে এবং সে বন্ধনের মধ্যে সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি, লালন, ইত্যাদির নিরাপত্তা থাকলেও দম্পতির মানসলোকে সে নিরাপত্তা তো ততক্ষণে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে।

একথা ভুললে চলবে না যে, ঐক্যদাম্পত্যে মানুষ পৌঁছেছে ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরে। গোষ্ঠী দাম্পত্য, কৌম দাম্পত্য, কৌল (কুল বা বৃহৎ পরিবারের) দাম্পত্য পার হয়ে তবে দাম্পত্য পৌঁছেছে ঐক্যদাম্পত্যে। এবং দাম্পত্যের ইতিহাসে এর স্থায়িত্বও নেহাৎ কম নয়। এর আশ্রয়ে দাম্পত্য এমন এক স্থিতি লাভ করেছিল যা সভ্যদেশে একে এত দীর্ঘস্থায়ী করেছে। আজ বহু

ব্যতিক্রম বহু বিয়ে এ সম্বন্ধের প্রান্তে একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। পরিবার নিয়ে এঙ্গেলস, দাম্পত্য নিয়ে সিমোন দ বোভোয়া অনেক সংশয় প্রকাশ করে এ দুটির ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এখন বিবাহ সম্বন্ধে আইন খোলা রেখেছে অবাঞ্ছিত দাম্পত্য থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ, ফলে অনিচ্ছায় আমরণ বন্দিত্ব মেনে নেওয়া আজ আর বাধ্যতামূলক নয়। যদিও এ মুক্তির সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক সমস্যাও দেখা দেয়–সন্তানের ভবিষ্যৎ উপার্জনহীনা বধূর ভবিষ্যৎ, সংযুক্ত আয়ে কেনা সামগ্রী ও বাসস্থানের বিভাগ, ইত্যাদি, তবুও অসহ্য দাম্পত্য মুখ বুজে বহন করার দায় আজ আর কোনও পক্ষেরই নেই। কাজেই এখন আর একবার দাম্পত্য সম্বন্ধে নতুন করে ভাবা যেতে পারে।

ব্যতিক্রম এখনও স্বল্প সংখ্যক হলেও কিছু কিছু ঘটছে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে। বিয়ে না করে একত্রবাস, বিয়ে ভেঙে অন্যের সঙ্গে একত্রবাস, বিয়ে রেখেও যুগপৎ এক বা একাধিক সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাহচর্য–সদর রাস্তায় না হলে খিড়কির রাস্তায়–এ সবের ফলে বিবাহ ব্যাপারটাই আর একবার কাঠগড়ায় উপস্থিত। বলা বাহুল্য, এ সব ব্যতিক্রম ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও মাত্রায় বহুকাল ধরেই সমাজে চলিত ছিল, আজ এগুলো অনেক বেশি প্রকাশ্য এবং নায়ক নায়িকারা অনেক বেশি নিঃসংকোচ। এবং এগুলি প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের প্রতি এক ধরনের অনুচ্চারিত প্রতিস্পর্ধা। এ ছাড়াও বর ও কন্যাপক্ষের চেষ্টায় সংঘটিত বিয়ে ও প্রেমের বিয়ে ছাড়াও নতুন এক ধরনের বিয়ে ইতস্তত ঘটছে। সেখানে সম্ভাব্য পাত্র ও পাত্রী প্রেমে না পড়ে বিজ্ঞাপন দেখে বা অন্য কোনও ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে দু'জনে একত্রে বসে সেই সব আলোচনা করছে, যার অনেকটাই আগে দু'পক্ষের মা বাবারা করতেন। এক কথায়, এর মূল ব্যাপারটা হল বৈষয়িক হিসেব— আয় ব্যয়, বাসস্থান, আসবাবপত্র, পারিবারিক দায়িত্ব, জীবনযাত্রার আর্থিক মান, সঞ্চয় ও ব্যয়

সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, শখ, শৌখিনতা সম্বন্ধে আলোচনায় ঐকমত্যে পৌঁছবার প্রয়াস, মোটামুটি জীবন সম্বন্ধে ধারণা। গরমিল থাকলে আলোচনায় তার নিরাসনের চেষ্টা এবং সব দিকে সন্তোষজনক বোঝাপড়া হলে তবে বিবাহ। এ সব বিবাহের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেম অনুপস্থিত থাকে এবং ব্যাপারটা নতুন হলেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংসার প্রেম ও আবেগ ছাড়াই ঠিক চলছে,, পরস্পরকে সহনীয় বা পছন্দ করা যায় এমন সহাবাসিক রূপে মেনে নিয়ে। এই দাম্পত্যে যৌন সম্পর্ক আছে, আর আছে বৈষয়িক, ব্যবহারিক সহযোগিতা, হয়তো চিন্তার ক্ষেত্রে কিছু সাযুজ্য, রুচির ক্ষেত্রে ঐক্য। কিন্তু প্রেম এ সব বিয়েতে কদাচিৎ দেখা যায়, এবং এ সব দম্পতি প্রেমের জন্যে উৎসুকও নয়, প্রেমের অভাবে এরা ক্লিষ্টও নয়। এটা একটা আধুনিক বিকল্প, কার্যকর এবং নিরাপদ। এ ব্যবস্থা থেকেও বেরোবার পথ বিবাহ বিচ্ছেদ– আইনের দিক খোলা, কাজেই আগের বন্ধন এখানে গোড়ার থেকেই বেশ শিথিল বলেই বেরোবার দিনে মারাত্মক কিছু প্রতিক্রিয়া হয় না। যেমন হিসাব করে গুছিয়ে শুরু করা গিয়েছিল মোটামুটি নিরুত্তাপ দাম্পত্য, চিড় দেখা গেলে বা দুজনের একজনের অন্য কারও প্রতি আসক্তির উদ্রেক হলে আবার তেমনই হিসেব করেই তাঁবু গুটিয়ে ফেলা। পাশ্চাত্য দেশে অবশ্য এটি বেশ কিছুকাল যাবৎ চলিত আছে।

বিনা বিবাহে একত্রবাসও অধুনা-আচরিত আর একটি বিকল্প। বিচ্ছেদের পথে এখানে আইনের কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ এর শুরুতেও আইন বা অনুষ্ঠানের কোনও ভূমিকা ছিল না। নানা কারণেই দ্বৈমত্য দেখা দিতে পারে; সেটা অলঙ্ঘনীয় হলেও তল্পি গুটিয়ে যে যার পথে রওনা হতে পারে। তিক্ততা না থাকারই কথা, তবু মাঝে মাঝে ঈর্ষার উদ্রেক হয় এবং তখন তিক্ততা দেখা দেয়। সচরাচর এ সব দাম্পত্যে সন্তান আসে না, এলেও তা নিয়ে সমাজ

বা আইনের কিছু করণীয় থাকে না, কারণ এর শুরুতে ওই দুটিকে পরিহার করা হয়েছিল।

প্রাতিষ্ঠানিক কারণে বিবাহ কি তা হলে আজ অবাস্তর হয়ে গেছে? এতগুলো বিকল্প দেখে তাই মনে হওয়া সম্ভব। সমাজে এখন যুগপৎ যত রকম দাম্পত্য আছে–সংবিধানসিদ্ধ, সামাজিক ভাবে অনুষ্ঠিত বিবাহ, বিনা বিবাহে সহবাস, বিবাহ ভেঙে অপর সঙ্গী বা সঙ্গিনীর নিবিড় সান্নিধ্যে প্রকাশ্যে বা গোপনে সহবাস, একে অপরের স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্য সহবাস–এ সব গুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক বিবাহের উপযোগিতা সম্বন্ধে মানুষের সংশয়; বিকল্পের অনুসন্ধান এবং নানা বিকল্পের পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহবন্ধনের শৈথিল্য বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয় এবং তখন থেকেই সাহিত্যে এটি বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত। সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণাতেই আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা উচ্চারিত হয় যাতে বিবাহের ভিত্তি সম্বন্ধেই মানুষ সন্দিহান হয়। মনস্তাত্ত্বিকরা এমন কথাও বলেন যে, মানুষ মাত্রেরই যৌনবৃত্তিতে দ্বিচারিতা বা বহুচারিতা প্রকৃতিদত্ত; সমাজ তাকে গোপন করতে শেখায় এবং তার ফলে নানা মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। এ কথা সত্যি হলেও বলতে হয় চুরি করা, মারামারি করা, ইত্যাদি সমাজের পক্ষে অশুভ প্রবণতাও বহু মানুষের অবচেতনে জন্মগত লক্ষণ, সেগুলিকে প্রকাশ্যে প্রশ্রয় দিলে সমাজ কী করে টিকে থাকবে? আজি তো সামাজিক নিরাপত্তার জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই বাস করে, এইটিই তার পক্ষে কল্যাণকর। পারস্পরিক সাহচর্যে সমাজের যে ছকটি আজ প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে অন্তর্নিহিত বহু বিকৃতি, অন্যায় ও অত্যাচারের অবকাশ আছে ঠিকই, এবং মানুষ যুগে যুগে তার প্রতিবাদ করে তাকে প্রতিরোধ করে সংশোধন প্রয়াসী হয়েছে, হবেও। তবে দুটি নরনারীর এই একত্রবাসের মূল কাঠামোটা ভেঙে ফেলবে না, কারণ এর মধ্যে তার গোষ্ঠীগত আশ্রয় ও নিরাপত্তা। এটিকে রক্ষা করতে গেলে অবচেতনে

নিহিত–সমাজের পক্ষে হানিকর–বহু প্রবণতাকে নিজের মধ্যে দমন করতে হয় যাতে ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধি বা আপাত-তৃপ্তির জন্যে মানবগোষ্ঠীর ক্ষতি না হয়।

এমনই এক প্রবণতা বহুগামিতা। আবার বলছি, ঐক্যদাম্পত্যে যেখানে দম্পতির কোনও পক্ষের অন্যায় বা অত্যাচার কিংবা অপমান ঘটে, সেখানে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার এবং পরে আবার একটি সুখী দাম্পত্য খুঁজে নেওয়ার স্বাধীনতা স্বৈরাচারিতা নয়। সে অধিকার মানুষের সহজাত। একাধিক বারের হলেও; যদি না তা কেবলমাত্র নূতনত্বের সন্ধানে দায়িত্ববোধহীন ছোটাছুটি হয়। কিন্তু বহুচারিতার প্রবৃত্তি যদি নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ না করা হয় তা হলে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে তা শুধু দাম্পত্যের ভিতই টলিয়ে দেবে তাই নয় সমাজ দেহে এমন আঘাত করবে যা সহ্য করার কোনও দায়িত্ব সমাজের নেই। যেখানে সমাজের অন্যায় শৃঙ্খলে মানুষ অত্যাচারিত, সেখানে মানুষ অবশ্যই বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ করে অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করবে। কিন্তু যেখানে উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা সমাজের শৃঙ্খলা ভাঙার চেষ্টা, সেটা গোষ্ঠী স্বার্থের বিরুদ্ধ। সেখানে সমাজের পক্ষে যা হানিকর তেমন প্রবণতা দমন করার দায় নিশ্চয়ই যে কোনও সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ মানুষের আছে। উচ্ছৃঙ্খলতা শব্দটি দু' ভাবে নিষ্পন্ন হতে পারে: শৃঙ্খল ভাঙা অথবা শৃঙ্খলা ভাঙা। শৃঙ্খলাও মাঝে মাঝে শৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তখন তাকে ভাঙলে সমাজের মঙ্গলই হয়। কিন্তু যে শৃঙ্খলা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়', সুস্থ সংহতির জন্য যা আছে, তাকে ভাঙা সমাজ দেহে অকারণে আঘাত করা। সমস্ত উদ্দাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থকরার সুযোগ কোনও সমাজই দিতে পারে না। দিলে সমাজে উন্মত্ত তাণ্ডব দেখা দেবে এবং বহু নিরপরাধ মানুষ অকারণে কষ্ট পাবে। বহুগামিতার প্রবৃত্তি সুস্থ দায়িত্ববান মানুষ নিজের মধ্যে নিজের বিবেকের প্রণোদনাতেই দমন করে। কারণ অন্য কারও উদ্দামতা তার স্বার্থকে ঘা দিতে পারে। কাজেই বিবাহ মানেই

শৃঙ্খলবন্ধন নয়। যখন বিবাহ সে রকমটা হয়ে ওঠে, তখনকার যা আপদ্ধর্ম তা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রয়োগ করা চলে না।

অমৃত কলস

অথর্ববেদ অতি স্পষ্ট নিরাবরণ ভাষায় বলেছে 'কে কাকে এটি দিয়েছে? কাম দাতা, কাম প্রতিগ্রহীতা। কাম সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। কামের সঙ্গে তোমাকে প্রতিগ্রহণ করছি। কাম, এই তোমার ভূমি, তোমাকে গ্রহণ করুক অন্তরীক্ষ।'(১) যৌন প্রেমের মূল কামনায়, মূল, কিন্তু শেষ পরিণাম নয়। তবু পৃথিবীর এই একটি মাত্র সম্পর্ক যার ভিত্তি যৌন কামনায়, যে কামনা অতল সীমাহীন সমুদ্রে প্রবেশ করেছে; তাই প্রেমিক বলছে তার প্রেমিককে গ্রহণ করুক আমনই অবাধ সীমাহীন অন্তরীক্ষ। এই মন্ত্রে কামনাসঞ্জাত প্রেমের গভীরতা সমুদ্র ও আকাশের অনুষঙ্গে অনুরাণিত। খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো অব্দের মিশরী কবি আমেন মোসে-র কাব্যে শুনি প্রেমিক অসিরিসের মৃত্যুর পর আইসিসের বিরামহীন রোদন, যেন মাে◌ঝদুপুরে চিলনীর তীক্ষ্ণ করুণ রব। এই প্রেম পৃথিবীর অসংখ্য কাব্য উপন্যাস নাটকে অভিনন্দিত; সর্বত্র ধর্মীয় অতিকথায় প্রেমের দেবতা ও দেবী কল্পিত হয়েছেন এই আবেগটিকে একটি অতিপার্থিব মহিমায় মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে। একটা কারণ হল, সত্যকার প্রেম সকল মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে না; যার করে, স্পর্শমণির সম্পর্শে তার সত্তার উত্তরণ ঘটে এক অপার্থিব লোকে, যেখানে প্রেম আপন মহিমায় বিরাজিত। এই বিষয়ে সারা পৃথিবীর সকল সাহিত্য শিল্পের সাক্ষ্যই এক। সকলেই এর যৌন মূল সম্বন্ধে অবহিত থেকেও উপলব্ধি করেছেন এর যথার্থ অবস্থান এক উজ্জ্বল মহিমায়।

সত্যকার ঐক্যদাম্পত্য-বিবাহের মূল এই প্রেম। তাই আমরা ভারতবর্ষে বলেছি, গান্ধর্ব বিবাহ অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ, গুরুজনের অনুমতি বা নির্দেশনারও অপেক্ষা সে করে না। তাই এই বিবাহের গান্ধর্ব নামের সঙ্গে আছে সঙ্গীতের অনুষঙ্গ। যেন জাগতিক বাস্তবের মধ্যে থেকেও কোনও সুর-লোকের সঙ্গে এর আন্তর-যোগ। এই বিবাহ এমন এক সত্যে প্রতিষ্ঠিত যা প্রাত্যহিকের মধ্যে থেকেও প্রাত্যহিককে অতিক্রম করে একটি নিত্যকালের রমণীয়তাকে স্পর্শ করেছে। কাজেই ঐক্যদাম্পত্যের এই কল্পনাটি প্রাচীন; বাস্তবেও এর মূল নিহিত ছিল। এই দাম্পত্যের ভিত্তিতে রচিত পরিবারের মধ্যেও একটি মহিমা থেকে যায়। মহাভারত ভরতবংশের বংশধর পুত্র দৌষ্যন্তি ভারতকে সৃষ্টি করেছে গান্ধর্ব বিবাহের সন্তান রূপে। রূপক অর্থনয়, কিন্তু গূঢ় কোনও সত্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে এ তথ্যটি। এবং এ তথ্যের গভীর তাৎপর্যবিবাহের যৌনমূলকে স্বীকার করেও তাকে অতিক্রম করে প্রেম ও বিবাহের পূর্ণ বিকাশের একটি সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে। শুধু বৈষ্ণবসাহিত্য নয় সব চিরন্তন সাহিত্যই প্রেমের নানা অনুষঙ্গ স্বীকার করেছে। প্রেমে মোহ আছে। প্রেমিক-প্রেমিকা নাকি পরস্পরকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পায় না। যারা প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, তারাই কি পায়? তাদের ভ্রম হয় না? কবি বলেন:

যদি প্রেম হয় অমৃতকলস
মোহ তবে রসনার রস।।

থাক না মোহ? দুটি বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী মানুষ মোহের চোখে পরস্পরকে দেখলেও তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এমন আচ্ছন্ন বা কলুষিত হয় না যে, ভাবী জীবন সম্বন্ধে বিচার বা আলোচনা করতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম হবে। মোহ ছাড়াও প্রেমে আছে দুঃখ, বিরহ ও অপ্রাপ্তির আর্তি, নিজেকে অপরের যোগ্য নয় জানার গোপন দৈন্যবোধ ও আরও নানা আনুষঙ্গিক যন্ত্রণা। পূর্বরাগে শুধু

নয়, অনুরাগে, মিলনে, দাম্পত্য পর্বেও এ সবই আসে যায় নানা পর্বে, নানা লগ্নে প্রেমের উপলব্ধির স্তরে স্তরে।

প্রেমে প্রতিষ্ঠিত যে দাম্পত্য ও পরিবার তা বর-বধূকে ধ্বংস করে না বরং তা সম্মুখপানে চলিতে চালাতে জানে; প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বর্থ ত্যাগ করতে জানে। এ পরিবারে যে সন্তান আসে সে পায় মাধুর্যের একটি পরিবেশ এবং তার যথার্থ নিরাপত্তার ভিত্তি এই মাধুর্যের অন্তর্নিহিত শক্তিতে। সম্ভবত মানুষের জীবনে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ আকুতিই হল আর একটি মানুষের সঙ্গে সাহচর্যের সহমর্মিতার জন্যে। এই সাহচর্য সবচেয়ে ঋদ্ধ ও সুন্দর হয়ে ওঠে যথার্থ ঐক্যদাম্পত্যে। আবার বলা ভাল, মানুষের সমাজ ঐক্যদাম্পত্য পেয়েছে যৌন যুগ্নতার দীর্ঘ পরিক্রমার পরে। অসংখ্য দম্পতির ক্ষেত্রে এটা দেখা দেয় বিরূপ, বিকৃত, বেসুর ছন্দপাতে। কিন্তু সেটাই এর স্বরূপ নয়। মেকি টাকা বাজারে থাকা মানে কোথাও আসল টাকাও আছে। মেকি টাকার চাপের নীচে সেটি আপাতত অপরিদৃশ্যমান হলেও সে তো মায়ামাত্র হয়ে যায় না। এখন যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার প্রধান কারণ দুটিপ্রথমত, বহু যুগের ঐতিহ্যের প্রভাবে সারা পৃথিবীতে দাম্পত্যে নারীর অধোবর্তন ও অবনমন ঘটেছিল, বর্তমান সমাজ সেটির প্রতিকার চাইছে যাতে বিবাহবন্ধন উদ্বন্ধনে পরিণত না হয়। এ চাওয়া নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত: নারীকে দাম্পত্যের অর্ধাংশ রূপেই থাকতে হবে, অন্য কোনও ভূমিকায় শুধু নারীর অবমাননা নয়, দাম্পত্যেরই অপভ্রংশ ও বিকার ঘটে। দ্বিতীয়ত, বহু বিকৃতিতে, স্বার্থসংকীর্ণ, অহমিকানিষ্ঠ সংঘাতে যুগে যুগে দাম্পত্য থেকে প্রেম অন্তর্হিত হয়েছে। পড়ে থেকেছে শুধু বন্ধনটি। যে হতে পারত সহচর বা সহচরী সে হয়ে ওঠে কারা-প্রহরী। সহানুভূতির স্থান নেয় তিক্ত বিদ্বেষ, দুজনের মধ্যে মানসিক আশ্রয়ের পরিবর্তে গড়ে ওঠে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। বহুযুগ ধরে বহু দেশে পরিব্যাপ্ত দাম্পত্যের এই অপভ্রংশ মানুষকে সংশয়ী করে তুলেছে দাম্পত্যের আন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে, বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে। এ সন্দেহ বর্তমান

পরিপ্রেক্ষিতে ভিত্তিহীন নয়, একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রথমত সম্বন্ধ করে বিয়ে, যা এখনও বহুল-প্রচলিত, তাতে তরুণ দম্পতিটি কী অনুভব করে, তা নিতান্ত গৌণ হয়ে যায়। তাদের কাছে যে ভূমিকা চাওয়া হত সেটা ছিল ন্যূনতম। আমরা আগেই (দ্বিতীয় অধ্যায় 'কনকাঞ্জলি) দেখেছি, বিবাহ একটি দলগত খেলা। ফলে দলের খেলা ফুরোলে অনেক সময় দেখা যায় যে, বিবাহিত দুটি মানুষের কোনও আন্তরিক সাযুজ্য নেই। বোভোয়া বলছেন, একটি সামাজিক একক হয়ে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যই এবং সমাজের অংশ হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্যই যেন দুটি মানুষ মিলিত হল।(২) অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক বিবাহে বর ও কন্যার সম্মতি জানতে চাওয়া হয়। সম্মতি সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত নাও হতে পারে: নানা রকম চাপে আর্থিক বা পারিবারিক প্রয়োজনে, নির্ভরযোগ্য বৃত্তি ও আয়ের প্রত্যাশায়, উপযুক্ত বংশমর্যাদার প্রলোভনে, বিবাহিত নামে সামাজিক সমর্থন ও নিরাপত্তার লোভে সম্মতি আসতে পারে। কিন্তু যথার্থ বিবাহের পক্ষে সম্মতি যথেষ্ট নয়, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের গভীর আগ্রহ ও তীব্র আকুতিই সেই প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে। প্রকৃত বিবাহিত দাম্পত্যের এটাই ভিত্তিভূমি।

প্রাচীন ভারতে অশ্মরোহণ অনুষ্ঠানে বর বধূকে একটি শিলাখণ্ডের ওপরে দাঁড়াতে বলে, 'ওই শিলার মতো দৃঢ় হয়ে আমার জীবনে'। কথাটায় খাটি সুর বাজত যদি শিলাখণ্ডের ওপরে দু'জনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে দুজনেই ওই কথা বলত। অরুন্ধতী দর্শনের অনুষ্ঠানেও যদি দু'জনে বলত ধ্রুব দৌ, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবা অরুন্ধতী, আমরাও পরস্পরের জীবনে যেন ধ্রুব হই। তা নয়, সমস্ত দাম্পত্যে নিষ্ঠা একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার দায়টা দেওয়া হত বাধূটির ওপরে, তার পতিব্রত্য ছিল অপরিহার্য। তাকে সতী বধু হতে হবে অথচ ওই সতীর কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দই নেই। তাই ফাকি থেকে যায় বিবাহে, তাই দাম্পত্য নড়বড়ে শিলার ওপরে স্থাপিত হয়। দুজনে একই প্রেমের ভিত্তিতে

দাঁড়িয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যুগপৎ স্থায়ী সাহচর্যের কথা উচ্চারণ করতে পারলে ভিতটা খাঁটি হত। এবং সেটা সম্ভব হতে পারত শুধুমাত্র প্রেমনিষ্ঠ বিবাহেই।

বিবাহে পরস্পরের কাছে শাস্ত্রোক্ত প্রত্যাশাও খুব তাৎপর্যবহ। দ্রৌপদী সত্যভামার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, নিরন্তর দাসীর মতো স্বামীদের সেবা করি, তার বিনিময়ে পাই-সন্তান, শয্যা, মহার্ঘ্য, আসন, বসন, মাল্য, গন্ধ, স্বর্ণ ও অতুলনীয় যশ।'(৩) বস্তুগত প্রাপ্তি বিবাহে সর্বোচ্চ কাম্য–এ কথা উচ্চরণের মধ্যেই নিহিত দম্পত্যের অপমান। বিবাহে পুরুষনির্ভর অনুপার্জিকা নারী বস্তুগত ব্যবহারিক নিরাপত্তা নিশ্চয়ই পেত, কিন্তু সেটা তো বিবাহের বহিরঙ্গ। এখানে আন্তর-প্রত্যাশা বা প্রাপ্তির কোনও কথাই নেই, তাই এর মধ্যে বিবাহের স্বরূপকে অনুধাবন করা যায় না। বুঝতে অসুবিধে নেই, এ যশ পতিব্রতার, এবং এর অনুরূপ কোনও যশ পুরুষের কাম্য নয়, কারণ পত্নীব্রত পুরুষ সমাজে অপযশস্বী, তার অভিধা হয় স্ত্রৈণ। এই যেখানে সমাজ অনুমোদিত অধিকাংশ বিবাহের চেহারা, সেখানে আজ এই ঐক্যদাম্পত্যে আস্থাহীন মানুষ যদি নানাবিধ বিকল্প খোঁজে তা হলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু তারও আগে পরে কথা থেকে যায়। একটি নারী ও একটি পুরুষ সমস্ত দেহমন দিয়ে পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করার ফলেই সূচনা হয় প্রেমনির্ভর বিবাহ ও দাম্পত্য। শরীরও এখানে গৌণ নয়, মনও নয়। সমস্ত জীবজগতের মধ্যে শুধু মানুষের মিলনেই মনের একটা মুখ্য ভূমিকা আছে। এটা না থেকে যে মিলন তা তো শুধু জৈব বা বৈষয়িক স্তরেই থেকে যায় এবং সেটা বিবাহের একটা মৌলিক অপূর্ণতা।

দু'জনের মধ্যে নিবিড় মানসিক বন্ধন গড়ে উঠলে দুজন দুজনের কাছে স্বতন্ত্র ব্যক্তি রূপে দেখা দেয়। না হলে বিপত্তি। মানসিক সংযোগ ও মিলন ঘটার পূর্বেই ফুলশয্যা, যা এখনও এ দেশে অধিকাংশ বিবাহেই চলে আসছে। তাতে ওই ব্যক্তিপরিচয়ও গড়ে উঠতে পারে, তবে না গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও খুবই প্রবল। সেখানে ব্যাপারটার মধ্যে একটা স্থূলতা ও অন্তর্নিহিত অপূর্ণতারও যেন আভাস মেলে। এমন ভাবে যে মিলনের সূচনা তাতে দেহ যেন মাত্রাতিরিক্ত একটা গুরুত্ব পায় যা, আজকে অন্তত, মানুষের রুচিকে পীড়া দেয়। 'এই বিবাহ তত্ত্বগত ভাবে গ্লানিময়, কারণ (এ বিবাহ) দুটি মানুষকে পরস্পরকে শুধু শরীর হিসাবে জানার নরকে ঠেলে দেয়। ব্যক্তি হিসাবে জানতে দেয় না।'(৪) শরীর ও মন সমান প্রাধান্য পেলে তবেই দাম্পত্য সত্যকার একটি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এবং এ ভিত্তির কোনও বিকল্প নেই। বিবাহে মনের সাহচর্য, যাকে পাশ্চাত্য জগতে বলে সাহচর্যভিত্তিক বিবাহ, এটি সার্বত্রিক নয়।'(৫) কিন্তু এই পরস্পরের সাহচর্য্য কামনা, সহমর্মিত এগুলি প্রেমেরই অপরিহার্য অনুষঙ্গ, কামের নয়। কামনায় তীব্রতা থাকে পরস্পরের আসঙ্গের জন্য, সে-ও খাঁটি, কিন্তু অস্থায়ী, কামনা চরিতার্থ হওয়ার পরও পরস্পরের কল্যাণকামনায় প্রেমে নিরন্তর স্বার্থত্যাগে যে একটি মাধুর্যের সৃষ্টি হয়, শুধুমাত্র কামে তার স্থান নেই। এই সঙ্গকামনাকে স্থায়ী করাই ঐক্যদাম্পত্যের উদ্দেশ্য এবং শুধুমাত্র কামের সে সাধ্যই নেই। প্রেম থাকলে সংকীর্ণ সম্ভোগলিপ্সা নিজেকে অতিক্রম করে নিয়ে আসে সহিষ্ণু ও সুন্দরতর এক পরিবেশ, যেখানে দুজনের মধ্যে একটি আকাশ থাকে। সেখানে কল্পনার বিহরণ, সেই কল্পনায় একজন অপরের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যে কী প্রয়োজন তা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করে এবং প্রায়শই এই উপলব্ধির মধ্যেই তার কাছে প্রতিভাত হয় তার দিক থেকে অপরের বিকাশের জন্য কখন কতটা স্বর্থত্যাগ প্রয়োজন। ওই আকাশটুকু না থাকলে সে কল্পনা সক্রিয় হয় না, তখন আন্তঃব্যক্তিস্বার্থের কটু সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এক ধরনের

সংকীর্ণ অহমিকাসর্বস্বতা মুখ্য হয়ে ওঠে। তখন বিবাহ অবাঞ্ছিত বন্ধন। প্রেমে মুক্তিও আছে:

আমার প্রেম রবিকিরণ হেন।
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘিরে যেন।।

প্রেমে অবশ্যই পরস্পরের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু তার মধ্যে সহজাত যে প্রত্যয় থাকে তার দ্বারা ঈর্ষার উদ্রেক ঘটতে পায় না। সংঘাতের বাস্তব কোনও কারণ থাকলেও প্রেমের সম্পর্কে দুটি নারীপুরুষ তা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে; একবার নয়, বারবার। কারণ 'প্রেমে ভয় নেই, পরিপূর্ণ প্রেম ভয়কে সরিয়ে দেয়. যে ভয় পায় সে প্রেমে পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। প্রেম মৃত্যুর মতোই শক্তিশালী এবং অমোঘ।'(৬) এ প্রেম প্রকৃতিদত্ত বা সহজাত নয়, জীবনে এর উন্মেষ ঘটলে দীর্ঘ কঠিন সাধনার মধ্যে আত্মসমীক্ষার দ্বারা একে প্রতিদিন অর্জন করতে হয়। যাচাই করতে হয়; তবেই পুর্বরাগ অনুরাগের পথ ধরে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়।

'ভয় ছিল না দময়ন্তীর: মধ্যযৌবনা, দুই সন্তানের জননী, দীর্ঘবিরহের মর্মান্তিক যন্ত্রণায় মায়ের কাছে গিয়ে বলেন, 'নল বিনা তাঁর জীবন অর্থহীন, দুর্বহা। এবং তিনি নিশ্চিত জানেন, নল যেখানেই থাকুন না কেন, দময়ন্তী তাঁর জন্যে ব্যাকুল এ সংবাদ পেলে নিশ্চয়ই দেখা দেবেন।' দেখা গেল, এটা তার অনুমানমাত্র নয়, দৃঢ় প্রত্যয়; তার নিভীক প্রেমের ভিত্তি সত্যিই দৃঢ় ছিল। নল এলেন।
এমনই তীব্র আকুতি ছিল রুরুর। প্রমদ্বারার মৃত্যুর পরে জীবন তার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে প্রতীত হল, নিজের পরমায়ুর অর্ধেকের বিনিময়ে তিনি প্রমদ্বারাকে উজ্জীবিত করেন।'

এর মধ্যে স্বর্থত্যাগ আছে। নিজের পরমায়ু ক্ষতিস্বীকার করে প্রমদ্বারার জীবন চাইলেন রুরু, কারণ প্রমদ্বারা বিনা দীর্ঘ জীবন তার কাছে দীর্ঘ অভিশাপ মাত্র। পুরুষের প্রেমের তীব্রতার এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত। গ্রিক অতিকথায় আডমিন্টস-এর অবধারিত মৃত্যু নিবারিত হতে পারত কেবলমাত্র তার বিনিময়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলে। অবশ্য কোনও আত্মীয়ই রাজি হয়নি, হল শুধু সদ্যপরিণীতা স্ত্রী আলকেস্টিস। এ সব কাহিনিতে প্রেমকে এক নতুন মাত্রায় মণ্ডিত করেছে প্রিয়জনের স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ।

যে-প্রেম শরীরনিষ্ঠ হয়েও শরীরকে ছাড়িয়ে মনকে আশ্রয় করছে তার ওপরে বিবাহের ভিত্তি হলে সে বিবাহ অন্য এক স্তরে উন্নীত হয়। অন্তত যতদিন সে প্রেম সজীব থাকে। যদি সে প্রেমের মৃত্যু আসেও একদিন, তবু তার ওই উজ্জ্বল পর্বটা তাতে মিথ্যা হয়ে যায় না।

প্রেম প্রথম দর্শনে হতেও পারে, না-ও হতে পারে। জীবনে যেমন ভাবেই তার আবির্ভাব ঘটুক, তাতে গভীরতা আনে দুটি মানুষের রুচি, আদর্শ, চিন্তাধারা এবং আবেগনির্ভর সূক্ষ্ম সংবেদনাগুলির সাযুজ্য। আরও একটা বড় উপাদানের অভাবে প্রেম হতমান ও নিজীবি হয়ে পড়ে; তা হল পারস্পরিক শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মানুষ হিসেবে, প্রেমিক-প্রেমিকা হিসাবে, জীবনের সহযাত্রী হিসেবে। এর মধ্যে নিহিত থাকে পারস্পরিক বিশ্বাসও। (সংস্কৃত শ্রধ্ ধাতু, যার থেকে নিষ্পন্ন শ্রদ্ধা, তার মূল অর্থ, বিশ্বাস।) শ্রদ্ধা যদি হারিয়ে যায় তাহলে মানুষ হিসেবে পরস্পর পরস্পরের কাছে ছোট হয়ে যায়, তখন প্রেমের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা অনুকম্পা বা করুণা হতে পারে; কিন্তু শ্রদ্ধা বিনা প্রেম বাঁচে না, বিনা শ্রদ্ধার দাম্পত্য অনেক সময় দুর্বাহ হয়ে ওঠে। এই শ্রদ্ধা দর্শনে বা স্বল্প পরিচয়ে জন্মায় না, পরস্পরকে নিবিড় ভাবে চেনার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যেই এর উন্মেষ ঘটে ধীরে ধীরে। প্রেমনিষ্ঠ দাম্পত্যে শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এবং একই সঙ্গে এও সত্য যে, পরস্পরের কাছে শ্রদ্ধেয় থাকার

জন্য নিরন্তর দুজনের এক সাধনাও চলা চাই, যাতে দাম্পত্যের এই দৃঢ় ভিতে কোনও ঘানা লাগে। এর জন্য পরিচয় কিছু নিবিড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেটুকু ধৈর্য এবং সময় দিলে অনেক সময় হঠকারিতার দরুন অনুতাপ এড়ানো যায়। এ কথা ঠিকই, যে কিছুদিন মেলামেশার মধ্যেই দুটি মানুষের মনের সব দিক উদঘাটিত হয় না, বিবাহের পরে প্রত্যহ পরস্পরের নতুন নতুন দিক চোখে পড়ে, তার মধ্যে অনাশঙ্কিত দোষত্রুটি বা মানসিক বৈষম্যও ধরা পড়তে পারে এবং তার দ্বারা সংঘাত আসতে পারে। এ-ও সত্য যে, প্রথম অনুরাগ স্বভাবতই অসহিষ্ণু: অদূরদর্শী গভীর ভাল লাগাকে ভালবাসা বলে ভুল করার ইতিহাসও বিস্তর। নতুন প্রেমের কাছে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা কতকটা বেরসিকের মতোই কাজ। তবু সেই মধুর অনুরাগ যাতে তার মাধুর্য অক্ষুন্ন রাখতে পারে–এবং প্রেমিক প্রেমিকার কাছে প্রেমের পরমায়ু দীর্ঘায়িত করাও তো এক বাস্তব স্বার্থই–এ জন্যে নিজের আবেগ ও অন্য পক্ষের মানসিকতা একটু ভাল করে। বোঝবার মতো সময় নিজেদের দিলে। ফলটা শুভ হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্যই এ সব সতর্কতা সত্ত্বেও ভুলবোঝাবুঝি ও বিরোধ দেখা দিতে পারে কারণ:

সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।

তবু এত কথা উঠছে এই কারণে যে, বিবাহ আনুষ্ঠানিক বা আইনের দ্বারা সিদ্ধ হোক, অথবা গান্ধর্ব মতে একত্রবাসের পরওয়ানাই হোক, বিবাহের দ্বারাই দাম্পত্য প্রতিষ্ঠা হয় ও পরিবারের সূচনা হয়। এবং এখনও পর্যন্ত সমাজ যেখানে যতটা এগিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে, এ ভাবে দুটি নারী পুরুষ যখন কাছাকাছি আসে, থাকে ও সন্তানকে আনে, দুজনের রচিত গৃহনীড়ে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, দুর্গত, পীড়িত মানুষ যেখানে বিপদে, প্রয়োজনে আশ্রয় পায়, তখন এই সহাবস্থানকে আইনে অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ

ভাবেই বিবাহ আখ্যা দেওয়া চলে। যে নীতিটা দম্পতির পক্ষে অনুসরণ করা আবশ্যক তা হল, তারা যেন যথাসাধ্য পরস্পরের বা সন্তানের বা সে পরিবার-সম্পৃক্ত অন্য কারও কোনও ক্ষতির নিমিত্ত না হয়। দম্পতির যে কোনও একজন তৃতীয়ের প্রতি যদি এমন ভাব আসক্ত হয় যাতে তার কাছে পুরাতন প্রেম অর্থহীন হয়ে যায় ও সেই তৃতীয়ের সঙ্গে মিলনেই শুধু জীবন অর্থপূর্ণ হয়, তা হলেও পূর্ব সম্পর্কের সঙ্গীর সঙ্গে খোলাখুলি এ বিষয়ে কথা বলে সে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর এবং সন্তানের প্রতি যাতে যথাসম্ভব কম অবিচার হয়। সে ব্যবস্থা করে বিচ্ছিন্ন হওয়াই ভাল। এর জন্যে প্রয়োজন দায়বদ্ধতার মানসিকতা; পরস্পরের প্রতি, সন্তানের প্রতি এবং পটভূমিকায় যে সমাজ আছে তারও প্রতি। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেও কখনও কখনও মানুষ সুফল পেয়েছে এবং উত্তরকালে সে নিজেই বলেছে, ভাগ্যে ঝোকের মাথায় হঠাৎ সরে যায়নি! আবার সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেও নতুন আকর্ষণ থেকে সরে থেকেছে। সংসারটাকে বজায় রেখে বাইরে থেকে পরস্পরের প্রতি ও সন্তানের প্রতি পূর্ণকর্তব্য পালন করার আনন্দে সান্ত্বনা পেয়েছে, নবতর আকর্ষণ থেকে সরে থাকার এমনও বহু দৃষ্টান্ত আছে। কখনও বা অসুস্থ স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি মমতাবশে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং আত্মার গভীরে পারস্পরিক দায়বদ্ধতার কাছে খাঁটি থাকার পুরস্কারে শান্তি পেয়েছে এমনও শোনা গেছে। কখনও বা প্রথম প্রেমের মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ করে নিজের অন্তরে আত্মসম্মানবোধকে অপ্রতিহত রাখবার পরিতৃপ্তিতে স্বস্তি পেয়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়।

শেষ কথা কে বলবে? অনুরাগ প্রেম-মিলন-বিবাহ-দাম্পত্য-সন্তান-পরিবার যে দীর্ঘ তন্তুতে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তার সূচনাতে যদি নারীপুরুষ তলিয়ে দেখে যে একে অন্যকে বাদ দিয়ে থাকতে পারবে না, মিলিত হতে না পারলে জীবন নিরর্থক হবে এবং তার সঙ্গে যদি এ-ও অনুভব করে যে, এ প্রেম এমনই ঋদ্ধ যে এর জন্যে অনেক ক্ষতি, অনেক ত্যাগ স্বীকার করা যায় এবং

তারা মনে মনে নিজেকে সে জন্যে প্রস্তুত করে, তা হলে অনেকটা স্থির ভিত্তির ওপরে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুজনেরই জীবনে অন্য অনুরাগের সম্ভাবনা প্রথম থেকে স্বীকার করে দ্বার মুক্ত রাখার সাধনাও করা প্রয়োজন। হয়তো কোনও দিনই অন্য অনুরাগ দেখা দেবে না, কিন্তু দিতে পারে–এ সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা মুখতা। যদি দেখা যায়, তা হলে সে নিয়ে যেন তিক্ত সংঘর্ষ না হয় তেমন মানসিক প্রস্তুতি এবং সাধ্যমতে, অন্তত নিজের কাছে অপরকে যথাসম্ভব প্রসন্নচিত্তে মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার থাকা প্রয়োজন। সত্যই এ কাজ সহজ নয়, কিন্তু নিজেকে বলা প্রয়োজন, 'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।' প্রেম অপরের প্রতি যে অধিকার দেয়, তা ততক্ষণই সত্য, যতক্ষণ নূতন অনুরাগ পুরাতন প্রেমকে আচ্ছন্ন না করে। করলে অবশ্যই মর্মের গভীরে রক্তক্ষরণ হতে থাকবে এবং তা দুঃসহ, দুর্বাহ; কিন্তু প্রেমের মূল্যও নানা ভাবেই মানুষকে দিতে হয়। এমনও বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নবীন অনুরাগ দীর্ঘায়ু হয়নি। প্রথম প্রেমের কাছেই ফিরতে হয়েছে। তখন অপরপক্ষের রুষ্ট বা বিমুখ না হওয়ার সাধনাও প্রয়োজন। ভুললে চলবে কেন যে, কোনও বস্তু ভাঙা সহজ, জোড়া কঠিন এবং সেটি সাধনাসাপেক্ষ। এমন ভাবে দ্বিতীয়বারে জোড়ার পরেও দাম্পত্য মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রবাহিত হচ্ছে, তা-ও বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়।

---

১. ক ইন্দং কস্মা অদ্যুৎ? কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা। কামঃ সমুদ্রমবিশৎ। কামেন ত্বা প্রতিগৃহণামি। কামৈতত্বে ভূমিত্বা গৃহণাম্ত্তরীক্ষম।। অথর্ব (৩:২৯:৬)।

২. 'Marriage is only a means of integration into society. The Second Sex. p. 447

৩. মহা, বনপর্ব (৩২২-৩২৩)

৪. ‘Marriage is obscene in principal in dooming them to know each other as bodies, not as persons. The Second Sex, p. 463

৫. The Western concept of companinonship marriage is unusual. Elsewhere marriage is not entered into for the sake of companionship Marriage and Love in England, p 54

৬. ‘There is no fear in love, perfect loye casteth out fear He who fears has not been perfected in love Love is as strong as death IJohn f 18; Song of Solomon 86

ভবিষ্যৎ

এখনকার সমাজে দাম্পত্য সংঘর্ষের একটা মূল হেতু হল সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বিলাসের উপকরণ বাহুল্য। মেয়েরাও পিতা মাতার ওপর চাপ সৃষ্টি করে: চাই বহুবিঘোষিত অলংকার, আসবাব, মহার্ঘ্য বৈদ্যুতিক নানা যন্ত্র, যার দ্বারা গৃহকর্মে সময়লাঘব হয়; তা ছাড়াও প্রদর্শন মূল্য আছে এমন বহু সব বস্তু। এসবের সঙ্গে তারা দূরদর্শনের প্রদর্শিত যে সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অবাঞ্ছনীয় দাম্পত্যের জীবনযাত্রার চিত্র দেখা যায়, যার মধ্যে জীবন সম্বন্ধে কোনও সুস্থ বোধ প্রায়শই অনুপস্থিত, তার দ্বারা প্রভাবিত হয় কিশোর কিশোরী ও তরুণ তরুণীর চিত্ত। প্রায়ই উপকরণ বহুল সুসজ্জিত বাড়ি, বাগান, গাড়ির পরিবেশে শুরু হয় ছবি। ক্ষণে ক্ষণে উদ্দাম যৌন প্রেরণার

চমক উত্তেজক বেশোবাসে প্রায় নগ্ন নারীপুরুষের অবাধ দায়িত্ব-বোধহীন নাচে, বোধ বুদ্ধিহীন চটকদার সংলাপে, যথেচ্ছ আচরণে, এবং সম্পূর্ণ জাদুকরী মায়ায় শেষ পর্যন্ত সব আপাত সমস্যার একটা সুরাহা হওয়ার দৃশ্য। এর মধ্যে থাকে প্রচুর ষড়যন্ত্র, আদিম বর্বরতা, হিংস্র আক্রমণ, প্রচুর অস্ত্রের ঝঞ্ছনা; অনিবার্য ভাবে থাকে গুলি, বারুদ, ধর্ষণ ও গুণ্ডামি, বহু কুসংস্কার ও প্রচলিত ধর্মবোধের ও অলৌকিকের উপাদান। এ দৃশ্য দিনের পর দিন দেখার ফলে যে ধরনের স্থায়ী মস্তিষ্কবিকৃতি দর্শকের অবচেতনে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হতে থাকছে, তার একটা ফল জনমানসে অনিবার্য ভাবে দেখা দেবেই।

পাশাপাশি পরিবারে যদি সুস্থ সংস্কৃতির পরিবেশ থাকে, বিদ্যালয়ে ও কর্মস্থলে যদি বিকল্প সংস্কৃতির চর্চার দ্বারা এ সব বিকৃত মানসিকতার সমালোচনায় ছেলেমেয়েরা যোগ দেয়, পৃথিবীর সুস্থ সংস্কৃতি ও সুন্দর ঐতিহ্যের ভাণ্ডার যদি তাদের সামনে উদ্ধারিত করা যায় তা হলে— হয়তো এই আগ্রাসী পণ্যলোভাতুরতা থেকে নিষ্কৃতি মেলে। তা হলে হয়তো, দাম্পত্যে প্রবেশের মুখেই দুটি নরনারী মনের মধ্যে বস্তু ও ভোগের অদম্য বাসনা নিয়ে নবজীবনে প্রবেশ করে না। ইদানীং বহু কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমিক যে রকম অকল্পনীয় ভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছে, ব্যবসায়ীর সামনে পৃথিবীর সমস্ত বাজার খুলে যাওয়ার সমৃদ্ধি তথা ভোগ্যপণ্যলাভের যখন কোনও সীমাই আর নেই, তখন মানুষ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত জীবন সম্বন্ধে অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছে। নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মধ্যেও অন্ধগলিপথে যে বিপুল পরিমাণে টাকা পুঞ্জিভূত হয়ে কালোবাজারে পৌঁছচ্ছে তাতে সৎ দরিদ্র ব্যক্তিকে ক্রমেই মুখ ও কৃপাপাত্র বলে গণ্য করা হচ্ছে। চোখের জলে এক অতি ধনীর সুন্দরী তরুণী গৃহিণী বলেন, 'পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে সব রকম কাম্য ভোগ্য পদার্থ এনে দিয়েছে স্বামী, দেয়নি এতটুকু ভালবাসা, মমতা।'

'ভালবাসা নেই তো এত দামি সব জিনিস আনে কেন?'

‘ওর ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন। তা ছাড়া, ওর পার্টিতে আমার অঙ্গে এ সব কাপড়-গয়না ওর পদোন্নতির উপায়। ওর সহকর্মীদের ঈর্ষা উৎপাদন, ওর ওপরওয়ালার উদ্যত কামনা আমার ওপরে। এর নানা পরিণতি হতে পারে; কোনওটাতেই ওর আপত্তি নেই যদি তাতে ওর সামাজিক অধিরোহণের পথটা খুলে যায়।’

‘তোমার কী প্রতিক্রিয়া?’

‘হয়ত লোভে তলিয়ে যার কোনও নরকে। নইলে এই প্রেমহীন কুবেরপুরীতে ঐশ্বর্য্যে, সুরায়, উন্মাদনায় ভুলতে চেষ্টা করব যে এটা নরকই।’

এটি একটি বাস্তব সংলাপ এবং এমনি আরও বহু দৃষ্টান্ত বাস্তবে আছে। এমন কথা বা এর প্রতিধ্বনি ইতস্তত মাঝে মাঝেই শোনা যায়। অতিভোগ যে দাম্পত্যকে বিপথে নিয়ে যায়, সুখের বদলে দেয় সম্ভোগ, এ আজ ঘরে ঘরেই দেখা যাচ্ছে। প্রায়ই শোনা যায়, জীবন যখন একটাই, তখন যতটা ভোগ করে নেওয়া যায়। তার চেষ্টা করতে দোষ কী? দোষ প্রথমত, ওই নগ্ন অতিলুব্ধতা মানুষের কুৎসিত একটি রিপু, যা অশুভ এবং অশুচি। দ্বিতীয়ত, এই লোভের ভোগের আতিশয্যে মানুষ সেই সব কিছুকে হারাতে বসেছে যা জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। প্রেম, আদর্শ, মানবিক মূল্যবোধ, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তৎপরতা, নতুন সুন্দর এক পৃথিবী রচনার স্বপ্ন। কুবেরের সাধনা শ্রীকে পরাহত করছে, অতিভোগের লালসা দাম্পত্যকে কলুষিত করছে।

চোখের সামনে অতি দ্রুত মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। আজকের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী প্রতিদিনই এই অবনমিত মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। প্রচারমাধ্যম যে ঐশ্বর্যের স্বপ্ন ছবির পর্দায় তুলে ধরেছে, এরা এদের

ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে ওই ঐশ্বর্যের মধ্যে কল্পনায় নিজেকে প্রতিস্থাপিত করে। ফলে বাস্তবে যখন তা সম্ভব হচ্ছে না। তখন দম্পতির জীবনে দেখা দিচ্ছে অন্তঃকলহ, একে অপরকে দোষ দিচ্ছে ওই অবাস্তব স্তরের ঐশ্বর্য না পাওয়ার জন্যে। এর জন্যে প্রয়োজন সুস্থ জীবনবোধ, যুক্তিনির্ভর আলোচনা, বাস্তববোধ ও ভোগ্যপণ্যের মাদকতা থেকে আত্মরক্ষা করবার মতো আত্মসংযম। একবার যদি দাঁড়িপাল্লায় তারা মেপে দেখে যে টাকা দিয়ে যা কেনা যায় এমন বস্তুর বিনিময়ে তারা হারাতে বসেছে, টাকা দিয়ে যা কেনা যায় না। সেই প্রেম–তা হলে ঐশ্বর্যের মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে ছোেটা থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করতে পারে। উপকরণবাহুল্যের মধ্যে যে কুরুচি ও নগ্ন লুব্ধতা আছে তাকে স্বরূপে চিনে তা পাওয়ার উদগ্র বাসনা থেকে মুক্তি পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে এত কথা বলার কারণ গণমাধ্যমের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে নতুন নতুন চ্যানেল যুক্ত হচ্ছে এবং সরকার গ্রামে গ্রামে দূরদর্শন পাঠাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সরকারের দিক থেকে গণশিক্ষার উদ্দেশ্য এখানে গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য হল বহুজাতিক সংস্থার অসংখ্য ভোগ্যপণ্য সম্ভারের যে অজস্র সমাবেশ তার জন্য ক্রেতা চাই। দূরদর্শনের দর্শক সেই সম্ভাব্য ক্রেতা। কোনও দম্পতি যদি এই গুঢ় অভিসন্ধি বুঝতে পেরে দুরন্ত লোভ সংবরণ করতে পারে, নিজেদের আয়ের পরিমাপে ক্রয়ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে পরস্পর আলোচনা করে তাহলে বহু অসম্ভব লোভের ও অতৃপ্তির অন্তর্জ্বালা থেকে রক্ষা পায়, তাতে শুধু টাকাই বাঁচে না, বাঁচে দাম্পত্য শান্তি।

দুটি মানুষ, যারা আগামী প্রজন্মের সূচনা করবে নিজেদের সন্তানের মধ্যে দিয়ে, যারা আগামী পৃথিবীকে, অত্যন্ত স্বল্পাংশে হলেও নির্মাণ করবার দায়িত্ব নেয় নিজেদের মিলনের সূত্রে, তারা পরস্পরের কাছে সমকক্ষরূপে প্রতিভাত হলে তবে মিলনে একটি মর্যাদা আসবে যা অন্যথা অসম্ভব। শ্রেয় এবং হেয়, প্রভু এবং ভৃত্য, আজ্ঞাকারী এবং আজ্ঞাবাহীর মধ্যে কোনও সমতা আসা সম্ভব নয়। এবং, সেই কারণেই দায়িত্ব এবং অধিকারের অসম বন্টন নিয়ে

নানা বিপত্তি দেখা দেয়। তখন চুলচেরা হিসেব হতে থাকে দায়িত্ব ও অধিকারের নুন্যতা ও আধিক্য নিয়ে— অশান্তি পরিণত হয় সংঘাতে। কখনও বা সে সংঘাতের সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন ঘটে বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ সঙ্গে নিয়ে আসে তার বহুতর জটিল অনুষঙ্গ। বিবাহ ব্যাপারটাই যদি প্রেম নির্ভর ও পরস্পরের শ্রদ্ধা বিশ্বাস, মানসিক সৌজন্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা আইনে নিষ্পন্ন হোক, বা অনুষ্ঠানে অথবা সম্পূর্ণ নিরনুষ্ঠান গান্ধর্ব্বমিলনের দাম্পত্য হোক, তার নিজস্ব একটি স্থির মহিমায় যে বিরাজিত থাকে। পরিবর্তন, অথবা বিপর্যয় ঘটতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ তা না ঘটে– এবং কখনও কখনও আদৌ তা ঘটে না–ততক্ষণ এমন এক মানবিক সত্যে এর ভিত্তি স্থাপিত থাকে যে নরনারীর মিলনের অন্তর্নিহিত যথার্থ সৌন্দর্য তাকে মূল্যবান করে তোলে। 'বিবাহ যে রকমই হোক না কেন, এটি একটি উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত চুক্তি এবং এ চুক্তি আদর্শ ভাবে সফল হত যদি দুটি সম্পূর্ণ স্বনির্ভর মানুষ। শুধুমাত্র পারস্পরিক প্রেমের অনিরুদ্ধ প্রবর্তনায় মিলিত হত।'(১) যতক্ষণ পর্যন্ত এ মিলন সজীব থাকে ততক্ষণ গার্হস্থ্য, আর্থিক সামাজিক বাধায় এর কোনও ক্ষতি হয় না। সমস্যা হয় প্রথমত যখন দুটি মানুষ আন্তর আবেগের প্রবর্তনায় কাছাকাছি আসে না। অথবা জীবনের এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপটি সম্বন্ধে যখন কতকটা অসহিষ্ণুতা বা চাঞ্চল্য থেকে যায়, ফলে পরস্পরকে চিনবার, জানিবার ও বোঝবার জন্য প্রাথমিক ভাবে যে সময়টুকু দেওয়া দরকার সেটাকে সংক্ষিপ্ত করে কিন্তু পরে পশ্চাত্তাপে শোধ করে অসহিষ্ণুতার এই মূল্য। এ ধরনের পরিণাম এড়ানো যায়–সম্পূর্ণ ভাবে না হলেও অনেকটাই। স্বীকার করাই ভাল যে, প্রথম প্রেম স্বতই দুর্বার, কতকটা বা অন্ধও। ঠিক এই কারণেই একটু সময়, একটু গভীরে চেনাজানা, পরস্পর সম্বন্ধে এবং নিজের আন্তরিক আবেগকেও চেনা ও পরীক্ষা করার ধৈর্যটুকু ওই আবেগনির্ভর গান্ধর্ব্বমিলনকেই দীর্ঘ পরমায়ু দিতে পারে। এ-তো প্রেমিকযুগলের স্বার্থেই। প্রেম কিছু আত্মত্যাগের প্রেরণা দেয় যা শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ বা পাতিব্রাত্য দিতে পারে না। এইখানেই প্রেমের অপরাজেয় শক্তি,

যা মৃত্যুর মতোই অমোঘ। যে বিবাহ বা দাম্পত্য এই প্রেম থেকে সঞ্জাত, তার অগ্নিপরীক্ষা নিজের মধ্যেই ঘটে এবং সে পরীক্ষায় জয়ও আসে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে। সে প্রেমে ভয়ের স্থান নেই এবং সেই প্রেমেই গান্ধর্ব্বমিলন, বিবাহ বা দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা। প্রেমনির্ভর মিলন ও বিবাহ আনুষ্ঠানিকই হোক বা নিরনুষ্ঠানই হোক, তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত যুগলজীবনের দাম্পত্যের যে সুষম ও দীপ্তি তা যুগে যুগে মানুষকে আকর্ষণ করেছে, করবেও। তার কারণ, মানুষ এখনও এর কোনও বিকল্প পায়নি।

———————

১. The deal . would be for entirely self sufficient human beings to form unions one with another only in accordance with the untruncated dictates of their mutual love. The Second Ser, p 490)